বাঘা যতীন

"মরণ সাগরপারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি,
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর
তোমাদের স্মরি।"

BAGHA JATIN : A Bengali biography of
Jatindra Nath Mukherjee
By : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুমুখ মিত্র

প্রকাশক :
শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস
শিক্ষা-ভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক
রুবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

বাঘা যতীন

মণি বাগচি

শিক্ষা-ভারতী ॥ ৭/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৯

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

গৌতম বুদ্ধ, রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবির আলো, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, নিবেদিতা, সুধীরকুমার সেন, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, জননায়ক জওহরলাল, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র, বীর সাভারকর, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, নিবেদিতা-নৈবেদ্য, লোকমাতা নিবেদিতা, কেমন করে স্বাধীন হলাম, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, মহাচীনে নেহরু, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহ, নানাসাহেব, বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, অমর-জীবন, আমাদের বিদ্যাসাগর, কাজলরেখা, লীলা-কক্ষ, ছোটদের গৌতম বুদ্ধ, ছোটদের ছত্রপতি, ছোটদের বার্ণার্ড শ, ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের বঙ্কিমচন্দ্র, ছাত্রদের আশুতোষ, আমাদের বীর সৈনিক, Sister Nivedita, Our Buddha ও Swami Abhedananda.

।। পরবর্তী গ্রন্থ ।।

একটি মৃত্যুহীন প্রাণের এপিক জীবনী

দে শ ব ন্ধু

নির্যাতিত দেশকর্মী ও ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের অধ্যক্ষ

শ্রীবিনয় সরকার জে. পি.

এবং

শিল্পপতি ও শিক্ষাব্রতী,

শ্রীঅশোককুমার সেন

আদর্শ-চরিত্র এই বান্ধবদ্বয়ের করকমলে

লেখকের সকৃতজ্ঞ উপহার।

নব-ভারতের হলদিঘাট

●

কাজী নজরুল ইসলাম

বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট,
উদয়-গোধূলি রঙে রাঙা হয়ে
উঠেছিলো যথা অস্তপাট।
আ-নীল গগন-গম্বুজ-ছোঁয়া
কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল,
অস্ত-রবিরে ঝুঁটি ধরে আনে
মধ্য গগনে কোন্ পাগল।
আপন বুকের রক্ত-ঝলকে
পাংশু রবিরে করে লোহিত,
বিমানে বিমানে বাজে দুন্দুভি,
থর-থর কাঁপে স্বর্গ-ভিত্।
দেবকী মাতার বুকের পাথর
নড়িল কারায় অকস্মাৎ
বিনামেঘে হ'ল দৈত্যপুরীর
প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত।
নাচে ভৈরব, শিবানী, প্রমথ,
জুড়িয়া শশ্মান মৃত্যু-পাট,—
বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট।
অভিমন্যুর দেখেছিস্ রণ?
যদি দেখিস্‌নি, দেখিবি আয়,
আধা-পৃথিবীর রাজার হাজার
সেনারে চারি তরুণ হটায়।

ভাবী ভারতের না-চাহিতে আসা
নবীন প্রতাপ, নেপোলিয়ন,
ঐ 'যতীন্দ্র' রণোন্মত্ত—
শনির সহিত অশনি-রণ।
দুই বাহু আর পশ্চাতে তার
রুষিছে তিন বালক শের,
'চিত্তপ্রিয়', 'মনোরঞ্জন',
'নীরেন'—ত্রিশূল ভৈরবের।
বাঙালীর রণ দেখে যা রে তোরা
রাজপুত, শিখ, মারাঠি, জাঠ :
বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট।

চার হাথিয়ারে দেখে যা কেমনে
বধিতে হয়রে চার হাজার,
মহাকাল করে কেমনে নাকাল
নিতাই গোরার লালবাজার!
অস্ত্রের রণ দেখেছিস্ তোরা,
দেখ নিরস্ত্র প্রাণের রণ ;
প্রাণ যদি থাকে—কেমনে সাহসী
করে সহস্র প্রাণ হরণ!
হিংস বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি,
আয় অহিংস বুদ্ধগণ।
হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে, প্রাণ
দিতে পারে তারা হেসে কেমন।
অধীন ভারত করিল প্রথম
স্বাধীন-ভারত-মন্ত্র পাঠ,
বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট।

সে মহিমা হেরি ঝুঁকিয়া পড়েছে
অসীম আকাশ, স্বর্গ দ্বার,
ভারতের পূজা-অঞ্জলি যেন
দেয় শিরে খাড়া নীল পাহাড় !
গগন-চুম্বি গিরি-শির হ'তে
ইঙ্গিত দিল বীরের দল,
"মোরা স্বর্গের পাইয়াছি পথ—
তোরা যাবি যদি, এ পথে চল্ !
স্বর্গ-সোপানে রাখিনু চিহ্ন
মোদের বুকের রক্ত-ছাপ,
ঐ সে রক্ত-সোপানে আরোহি'
মোছ্ রে পরাধীনতার পাপ।
তোরা ছুটে আয় অগণিত সেনা,
খুলে দিনু দুর্গের কবাট।"
বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট !*

* বন্ধুবর শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

যতীনদা

•

মানবেন্দ্রনাথ রায়

আমরা তাঁকে সোজাসুজি 'দাদা' বলেই ডাকতাম। দাদাদের দেশে ও দাদাদের যুগে তিনি ছিলেন অতুলনীয়—তাঁর মতো দ্বিতীয়টি আর কাউকে আমি দেখিনি। আধুনিক শিল্পে যেমন, তেমনি আমাদের রাজনীতির সেই শৈশবকালে 'দাদাবাদ' ছিল একটি যুক্তিহীন মতবাদ। যতীনদা কিন্তু দাদাবাদের ধার ধারতেন না, কিংবা তিনি এর প্রবক্তা ছিলেন না। আর সব দাদাদের দেখেছি অপরকে আকর্ষণ করবার বিদ্যা অভ্যাস করতে; একমাত্র যতীন মুখার্জী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁকে কোনদিন এই বিদ্যা অভ্যাস করতে হয়নি, এটা ছিল তাঁর সহজাত। সেইজন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিদের কাছে তিনি একটি ধাঁধা ও নৈরাশ্যের পাত্র বলে গণ্য হতেন। দলে টানবার জন্য তিনি কখনো তাঁর জাল ফেলতেন না, তথাপি তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, এমন কি অন্য দাদাদের অনুচরবৃন্দও তাঁকে ভালবাসতেন। আকর্ষণ জিনিসটা যে কী, তা আমি তখন আদৌ জানতাম না।

যে বিশাল দৈহিক শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন এবং যা পরিণত হয়েছিল একটি কিংবদন্তীতে, সেটা কিন্তু তাঁর আকৃতি দেখলে প্রতীয়মান হতো না, যদিও তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ কুস্তিগীর। তিনি নিজেকে কখনো শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করতেন না। পরবর্তীকালে আমাদের সময়ের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। এঁরা সকলেই ছিলেন গ্রেট ম্যান বা বড়ো মানুষ; যতীনদা ছিলেন একজন গুড্ ম্যান বা সৎ ব্যক্তি, এবং আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে সৎ ব্যক্তি আমি আর একজনকেও দেখিনি। মৌল আদর্শের মানুষ হিসেবেই তাঁকে বুঝতে হবে। এই শ্রেণীর মানুষ, যদিও এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কালের বুকে কোন পদচিহ্ন রেখে যান না। আত্ম-অবলুপ্তি এঁদের স্বধর্ম। সাধারণশ্রেণীর পুঞ্জীভূত বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ ইত্যাদির অন্ধকার ভেদ করে এঁরাই বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেন আশার আলোকবর্তিকা। বড়ো লোকের সমাবেশের মধ্যে ভালো মানুষের স্থান কদাচিৎ হয়ে থাকে। এই ধারা ততদিন

চলবে যতদিন না সাধুতা বা সদাশয়তা মহত্ত্বের মানদণ্ড বলে স্বীকৃত হচ্ছে। মধ্যযুগীয় বীরত্বের প্রতিমূর্তি ছিলেন না যতীনদা—তিনি বিশেষ কোন যুগের মানুষ নন। তাঁর আদর্শ ছিল মানবিক এবং সেই হিসাবে ইহা দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করতে পেরেছে। তিনি নিজেকে একক্ষন কর্মযোগী বলে বিশ্বাস করতেন এবং আমাদের সকলের কাছে তিনি এই আদর্শটাই তুলে ধরেছিলেন। তিনিই প্রকৃত কর্মযোগী যিনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় রহস্যময়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। কর্মযোগী মাত্রেই হিউম্যানিস্ট বা মানবজীবনের অনুরাগী। যিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবিক কর্মের ভেতর দিয়েই আত্মোপলব্ধি সম্ভব, তাঁকে মানুষের সৃজনশীলতাকেও বিশ্বাস করতে হবে—বিশ্বাস করতে হবে যে, মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ামক। মানবতন্ত্রের ইহাই মূল কথা। যতীনদা ছিলেন একজন যথার্থ মানবতন্ত্রী—সম্ভবত আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম মানবতন্ত্রী মানুষ।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে, কি অহিংসার পথে এসেছে, এই বিতর্ক আজ নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাসের সাক্ষ্যই অভ্রান্ত। ভারতের স্বাধীনতার জন্ত বাংলার বিপ্লবীদের কি কঠোর তপস্তা করতে হয়েছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজো লেখা হয়নি। যাঁরা সেদিন কণ্টকবিদ্ধ চরণে অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের পথে নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই তো স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন। ফাঁসির দড়ি তাঁদের কণ্ঠনালী রুদ্ধ করতে পারেনি, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি, এমন কি শত নির্যাতনেও তাঁদের মেরুদণ্ড অবনমিত হয়নি। তাঁদেরই কণ্ঠে আমরা একদিন শুনেছি শিবের প্রলয় বিষাণ। বিপ্লবযুগের কাহিনীতে যাঁরা যবনিকা ফেলতে চান, বা বিপ্লবীদের প্রয়াসকে যাঁরা অস্বীকার করতে চান, তাঁরা ইতিহাসের নিগূঢ় সত্যকেই অস্বীকার করেন।

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-সাধনার ঐতিহ্য ও চিন্তাধারাকে ভারতবাসীর মন থেকে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছেন সত্য ও অহিংসার পূজারী গান্ধী। এই প্রসঙ্গে একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখকের একটি সুচিন্তিত অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি। মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর *Gandhi : A Study in Revolution* গ্রন্থে লিখেছেন: "Gandhi not so much won India's freedom as delayed it. The consciousness of the British in Britain might have been much more quickly aroused if there had been widespread rebellion and a consequent attempt to suppress it. In fact, Gandhi drained away from Indian nationalism whatever truly revolutionary content it had. In this, I think, he did, independent India a disservice." এডওয়ার্ডসের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে। যে রাজনৈতিক দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এলো, গান্ধী ছিলেন সেই দলের নেতা।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে এই বাংলা দেশে একটি তরুণের জীবনকে কেন্দ্র করে যে প্রাণবহ্নি জ্বলে উঠেছিল এবং বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কার্য শেষ করে একদিন বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে রক্ততীর্থ রচনা

করে যে, বহ্নি নির্বাপিত হয়েছিল, আজ তার উত্তাপ ও আলো দুই-ই উপলব্ধি করতে চাইছি কেন? বিপ্লবযুগের ইতিহাসের বুকে স্বর্ণাক্ষরে চিরাঙ্কিত থাকবে বাঘা যতীনের নাম। তিনিই বাংলার প্রথম বীর-সন্তান যিনি সম্মুখযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়ে স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। প্রাণ দিয়ে তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার তরুণদের প্রাণ, সার্থক করেছিলেন বাঙালীর সেই অগ্নি ও রক্তস্নানে পরিশুদ্ধ বিপ্লব-ব্রত। মাইকেল এডওয়ার্ডস যদি বাঘা যতীনের কথা জানতেন, আমার বিশ্বাস, তিনি এই কথা নিশ্চয়ই লিখতেন যে: It was Jatin Mukherjee who put revolutionary content in Indian nationalism, thereby paving the path of independent India. অর্থাৎ, ভারতের জাতীয়তার মধ্যে বিপ্লবের অগ্নিবীয সঞ্চার করে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিয়েছেন যতীন মুখার্জী।

এই শূরবীরের জীবনেতিহাস আজ শুনবার ও জানবার দিন এসেছে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮
১০, বাগুইআটি রোড
কলিকাতা-২৮

মণি বাগচি

বাঘা যতীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজেন্দ্রনাথের সৌজন্যে

বাঘা যতীন !

বাঘের মতোই শক্তি ও সাহস ছিল তাঁর।

সেই শক্তি ও সাহস সম্বল করে দুর্জয় ইংরেজ রাজত্বের ভিৎ টলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ-সিংহ সন্ত্রস্ত থাকত সর্বদা কখন এই বাঘের উদ্যত থাবা গিয়ে পড়ে তার ওপর।

বাঘা যতীন !

বিপ্লব-যজ্ঞের হোম-হুতাশন তিনি।

বিপ্লবী বাংলার বীরশ্রেষ্ঠ এই যোদ্ধা ছিলেন দেশজননীর কণ্ঠে যেন একটি রুদ্রাক্ষের মালা।

তাঁর জীবন-কাহিনী এক আশ্চর্য বীরগাথা।

স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবন-ব্রত।

সে-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন তিনি নিজেকে।

শিবাজী-প্রতাপের উত্তরসাধক ছিলেন তিনি। তাঁতিয়া তোপির সহগোত্র তিনি। জীবন-মৃত্যু ছিল তাঁর পায়ের ভৃত্য আর চিত্ত ছিল নির্ভীক। মৃত্যুঞ্জয়ী এই বিপ্লবী-বীর বালেশ্বরে বুড়িবলঙ্গের তীরে এক নির্জন প্রান্তরে মাত্র চারজন কিশোর বয়স্ক সহচরকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন নতুন হলদিঘাট সৃষ্টি করেছিলেন সেই দিনটি ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সুদিন। রক্তের অক্ষরে রেখে গেলেন তিনি একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর, মহাকালের হস্তাবলেপে যা কোনদিনই মুছে যাবার নয়।

'বাঘা যতীন' নামটি তাই আজো বাঙালীর স্মৃতিপটে জ্বল্ জ্বল্ করে।

কতোটুকুই বা ছিল সেই জীবনের পরিধি—মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এই তরুণ ছিলেন যেন যৌবনের একটি জ্যোতির্ময় বিগ্রহ।

শতাব্দীর পটে এমন উদ্দাম যৌবন বাঙালী অনেককাল প্রত্যক্ষ করে নি। "আমি নির্দয় নব যৌবন ভাঙনের মহারথে"—কবির এই কল্পনার যেন বাস্তব রূপ ছিলেন বাঘা যতীন। এঁর জীবনের কথা বলবার আগে সেই অগ্নিগর্ভ জীবনের পৃষ্ঠপটটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে হয়। কারণ বাঘা যতীনের বিপ্লবীমানসের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি উপলব্ধি করবার জন্য এর প্রয়োজন আছে।

বাংলার শ্যামল মাটিতে বিপ্লবী নাগশিশুরা যখন জন্মগ্রহণ করে নি, অথবা প্রথম যুগের বিপ্লবীদের কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করেছেন, বুঝি তাদেরই উদ্দেশ করে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় নালিশ এই যে, তাঁহারা আমাদের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। সেই তো তাঁহারা মরিলেনই, কিন্তু মরার মতো মরিলেন না কেন? যদি কোনো একটা উপলক্ষে তাঁহারা তা করিতেন, তবে আমরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিতাম।"

কবির এই আক্ষেপ ব্যর্থ হয় নি।

পরবর্তীকালে কবির এই বাণী মুষ্টিমেয় যে কয়টি বাঙালী তরুণের মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল, নবযুগের ইতিহাসে তাঁরাই বিপ্লবী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এই বিপ্লবীরা জানতেন, যে জাতির লোকেরা মরে, কিন্তু জীবন দিতে জানে না, তাদের বাঁচবার অধিকারই নেই। এঁদের প্রত্যেকেই হৃদয়-মন দিয়ে বুঝেছিলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই জাতি হিসাবে বাঁচবার জন্যই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস থাকা চাই, সঙ্গতি থাকা চাই। বাংলা ও মারাঠাদেশের বিপ্লবীরাই তো পরাধীন ভারতবাসীর জন্য মৃত্যুর সঙ্গতি অর্জন করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং প্রচুর পরিমাণেই তা অর্জন করেছিলেন তাঁরা।

পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাঁরা এই সুমহান্ উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন, তাই বাঙালীর বিপ্লব-সাধনা ব্যর্থ হয়নি।

অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া সকলের সাধ্যে কুলায় না—এর জন্য দরকার ইস্পাতের পেশী আর অপরিসীম মনের বল। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীরা শক্তিচর্চার সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষসাধনে মনোযোগী ছিলেন। মনের যে বল থাকলে মানুষ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র টেনে ছিঁড়তে পারে, সে বল যেমন তাঁদের প্রচুর ছিল, তেমনি সেই সঙ্গে ছিল নিয়মিত শরীর চর্চার ফলে অসাধারণ দেহের শক্তি। বাঘা যতীনের মধ্যে আমরা এই দুটি জিনিসের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। সামরিক, অসামরিক উচ্চপদস্থ বহু ইংরেজ রাজকর্মচারী তাঁর শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যেসব বাঙালী তরুণ আজকাল মাঠে-ময়দানে ও রাস্তায় 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' বলে গলাবাজি করে, তাদের মধ্যে প্রকৃত শক্তিধর ছেলে কয়টি আছে? তাই তো বাঙালীর আজ এই দুর্গতি।

বাংলায় বিপ্লববাদের শুরু কবে থেকে?

এই শতকের সূচনাকাল থেকে, বিশেষ করে কার্জনী বিধানে বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বাংলার অগ্নিযুগ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। আখড়া-আন্দোলন অর্থাৎ শরীরচর্চা হিসাবে যার শুরু, তারই চরম পরিণতি বোমা রিভলবার ও গুপ্ত সমিতি। তবে বাঙালীর মনে ও চিন্তায় বৈপ্লবিক ভাবের উন্মেষ ১৮৭০ সনের কোন এক সময় থেকে বলা চলে। এই বিপ্লবযজ্ঞের হোতা কারা ছিলেন? রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র—এই তিনটি নাম আগে করতে হয়। তারপর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ, নিবেদিতা, প্রমথনাথ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কয়জনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। এই তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের নামটাও বাদ দেওয়া চলে না। স্বদেশপ্রেমের প্রধান চারণকবি তো তিনিই ছিলেন।

বিপ্লবের অভ্যুদয় কখন ঘটে ?

যখন একটা অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে একটা তীব্র নৈতিক বিদ্রোহের ভাব অত্যাচারিতের মনে ঘনিয়ে ওঠে, অথচ নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পায় না, তখন তাদের মধ্যে যারা নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে চায় না, তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন অস্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, যা সহজে লুকিয়ে রাখা যায় কিংবা লুকিয়ে নিয়ে চলাফেরা করা যায়। কেননা, প্রত্যক্ষভাবে তার বিরুদ্ধে কিছু করবার শক্তি না থাকলেও, বোমা রিভলবার লুকিয়ে নিয়ে হঠাৎ আক্রমণে অত্যাচারী কর্মচারীর চরম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাখুবই সম্ভবপর। এদেশেও এইভাবেই বোমা-রিভলভারের দল গজিয়ে উঠতে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আখড়া-আন্দোলন থেকে এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত সমিতি। ইতিহাসের প্রয়োজন ও বিধান এর পিছনে যে সক্রিয় ছিল, তার কিছু আভাস রাষ্ট্রগুরু তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়ে গেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, সকল দেশেই অগ্রগামী চিন্তা বিপদের ঝড়কে সঙ্গে করেই প্রবাহিত হয়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেসব অগ্রগামী চিন্তা ছিল তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ছিল অন্যতম। স্বদেশী আন্দোলনই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। যদিও রাষ্ট্রগুরু এই চরম পন্থাকে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদকে জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে করতেন, তথাপি তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, স্বৈরাচারী শাসনই বাংলাদেশে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর কথা থেকেই উদ্ধৃত করে বলি : "বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণের মনে অলক্ষ্যে বৈপ্লবিক ভাবের আবির্ভাব হয়েছিল....সেই সময়ে সরকারী দমননীতির ফলে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিল, পরোক্ষভাবে তাই বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের তা ভুললে চলবে না।"

এই বিপ্লবের ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করেছিলেন কে ?

প্রমথনাথ মিত্র—এই নামটি সকলের আগে উচ্চারণ করতে হয়। ইনি 'পি. মিত্র' বা মিত্তির সাহেব, এই নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতি'ই এদেশে বিপ্লবের বেদী রচনা করেছিল। তারো অনেক বেশি কাজ করেছিল—আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে স্বধর্মে ও স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এঁর পরিচয় অনেকের কাছে আজো অজ্ঞাত রয়ে গেছে, যদিও 'পি. মিত্র' এই নামটির উল্লেখ অনেক বিপ্লবী সাহিত্যের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল। তাই তাঁর জীবনকথা এখানে একটু বলা দরকার। একথা ভুললে চলবে না যে, রাজনৈতিক জীবন ও বৈপ্লবিক জীবনের প্রেরণা অনেক স্বদেশভক্তই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত এই বিষয়ে বহুলাংশে এঁর কাছে ঋণী। আর বাঘা যতীন স্বয়ং পি. মিত্রকে বাংলাদেশে বিপ্লববাদের ভগীরথ বলে স্বীকার করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশের লোক ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র।

নৈহাটি গঙ্গার ধারে তাঁদের আদি নিবাস ছিল। তাঁর বাবা বিপ্রদাস মিত্র ছিলেন ওভারসিয়ার। প্রমথনাথ ঋষি বঙ্কিমের কাছে মাতৃভূমির বন্ধনমোচনের প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন। লম্বায়-চওড়ায় মানুষটি ছিলেন 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' আর সাহস-বিস্তৃত ছিল তাঁর বক্ষপট। মাথায় একটি বিশাল পাগড়ি, উন্নত ললাট, আয়তচক্ষু আর মেঘগম্ভীর কণ্ঠস্বর—এই মানুষটি যেন মূর্তিমান স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথেরও খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। হুগলী স্কুল থেকে প্রমথনাথ এনট্রান্স পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন এবং হুগলী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বিলাত যান। সেখানে তিনি যে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, সেখানকার সংস্কৃতের

ইংরাজ অধ্যাপকের মুখে হিন্দুধর্মের প্রশংসা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে যেন তখন এক নূতন ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হয়। "সবচেয়ে সুসভ্য জাতি হলো হিন্দুজাতি"—তাঁর ইংরেজ অধ্যাপকের এই কথাটি তরুণ প্রমথনাথের মনে সেদিন স্থায়ী দাগ কেটে দিয়েছিল। শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রশংসা তা নয়, তাঁর কাছে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রশংসা শুনতে শুনতে ভারত থেকে আগত এই বাঙালী ছাত্রটির মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। বিদেশীর মুখে স্বদেশের মহিমা শুনতে শুনতে প্রমথনাথ হয়ে ওঠেন একজন দেশপ্রেমিক। পরাধীন ভারতের অতীত গৌরব যেন তাঁর ধ্যান-ধারণার মধ্যে পেল স্থায়ী আসন। তখন থেকে তিনি খুব যত্নের সঙ্গে গীতা, উপনিষদ ও বেদান্ত পাঠ করতে থাকেন। গণিতের ছাত্র ছিলেন তিনি এবং একজন গাণিতিকের দৃষ্টি দিয়েই তিনি হিন্দুজাতির এইসব আধ্যাত্মিক গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গবেষণার পরিচায়ক বলে মনে করলেন।

যথাসময়ে পি. মিত্র ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। তিনি একাধারে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাস্বর প্রতিভা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শন, বিবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করেই নিরস্ত থাকেন নি। দেশ-বিদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসও তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। প্রমথনাথ যখন ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন তখন তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। হিন্দু-সমাজের তৎকালীন রীতি অনুসারে বিলাত-প্রত্যাগত প্রমথনাথকে জাতিচ্যুত করা হয়। উদার হিন্দুসমাজের এই আঘাতের ফলে পিতা বিপ্রদাস নৈহাটি পরিত্যাগ করে সপরিবারে কলিকাতায় চলে আসেন ও খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। পুত্র প্রমথনাথ কিন্তু পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন না; কারণ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার

প্রতি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তিনি শুধু নামে মাত্র হিন্দু ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৈনন্দিন আচার-আচরণে তাঁর মধ্যে ষোল আনা হিন্দুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রতিদিন স্বগৃহে পূজা-পাঠের সঙ্গে 'হোম'-এর অনুষ্ঠানও করতেন।

প্রমথনাথ স্বধর্ম ত্যাগ করলেন না। কিন্তু তাঁর স্বজাতি তাঁর প্রতি নিষ্করুণ উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করেছিল। কোন হিন্দু পরিবারই বিলাতফেরৎ বলে তাঁকে কন্যাদানে সম্মত হলেন না। যদি বা কেউ রাজী হলেন, তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের কথা তুললেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে, বরং তিনি আজীবন অকৃতদার থাকবেন, তথাপি তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধান মানবেন না, এবং হিন্দুর মেয়ে ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মেয়ে বিয়ে করবেন না। এরপর বিশুদ্ধ হিন্দুমতেই তাঁর বিয়ে হয়—একবার নয় দুইবার।

ইংলণ্ড থেকে ফিরবার পর পি. মিত্র প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকৃটিস করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তখনকার অন্যতম প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকেন। আইন-ব্যবসায়ে কলিকাতায় তিনি যখন আশানুযায়ী সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হলেন না, তখন তিনি মফঃস্বল 'বারে' চলে গেলেন—প্রথমে মেদিনীপুর, পরে রংপুর এবং অবশেষে বরিশাল। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তিনি বরিশালে সর্বশ্রেষ্ঠ আইনব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বরিশাল 'বার এসোসিয়েশনের' তিনিই ছিলেন প্রথম সভাপতি।

তখন কলিকাতায় রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রমথনাথের কথা সুরেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন এবং তাঁকে তিনি রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করবার জন্য আহ্বান করলেন। সে আমন্ত্রণের সঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছিল যে, ইচ্ছা করলে প্রমথনাথ অধ্যাপনার সঙ্গে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ও চালাতে পারবেন। রাষ্ট্রগুরুর আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন এবং রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্য, আইন,

ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কলিকাতায় এসে তিনি পূর্ণোদ্যমে একসঙ্গে তিনটি কাজ করতে থাকেন—অধ্যাপনা, আইন-ব্যবসায় ও সাংবাদিকতা। সেই সময় 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ভিন্ন 'বেঙ্গলী' কাগজেও প্রমথনাথের ধারাবাহিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী বেরুতে থাকে এবং ঐগুলি বিদগ্ধসমাজের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। ক্রমে সাংবাদিক পি. মিত্রের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুকাল পরে তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে আইন-ব্যবসায়েই আত্মনিয়োগ করেন। লেখক পি. মিত্রের নাম তখন বাংলার সীমা অতিক্রম করে বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর 'মিত্তির সাহেব' নামটা এই সময় থেকেই শিক্ষিত সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। অধ্যাপক হিসাবে তিনি মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি 'মিল' ও 'বেকনের' বই বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

যৌবনকালে পি. মিত্র প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং তা তিনি করেছিলেন প্রধানত সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে; তিনিই ছিলেন তখনকার অবিসংবাদী নেতা। ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টায় সকলের আগে তিনি ব্রতী হয়েছেন—পথ ও মত যাই হোক—এই কথা চিন্তা করে প্রমথনাথ তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আর সুরেন্দ্রনাথও এই তরুণ যুবকের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮৩ সনে দেশ ও দশের সেবায় হাইকোর্টের মানহানি করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ যখন কারারুদ্ধ হন, তখন সদলবলে জেল ভেঙে তাঁকে বার করে আনার বন্দোবস্ত পি. মিত্র করেছিলেন। সে সংকল্প শেষপর্যন্ত অবশ্য কোন কারণে কাজে রূপ নিতে পারে নি। কংগ্রেসে যোগদান করলেও মিত্তির সাহেব এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবেদন-নিবেদন ও তোষণনীতির সমর্থক ছিলেন না। বলতেন, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেশকে প্রকৃত

স্বাধীনতার পথে উত্তীর্ণ করে দেওয়া নিরামিষাশী কংগ্রেসের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হবে না।

ভাব-বিপ্লবী প্রমথনাথ বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। দেশসেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' ও অন্যান্য রচনার ভিতর দিয়ে বাঙালীর সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তা তখনো পর্যন্ত পুঁথির পাতা থেকে দেশের লোকের মর্মে স্থান পায় নি। জাতির মুক্তিসংগ্রামের জন্য যে দুই অমোঘ মন্ত্র তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন—সেই 'বন্দেমাতরম্' ও 'অনুশীলন' মন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা তখনো পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেন নি। বন্দেমাতরমের মর্মবাণী উপলব্ধি করা, ব্যাখ্যা করা ও তাকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করার গৌরব ছিল অরবিন্দের আর 'অনুশীলন' মন্ত্রকে জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠনের উপযোগী করে তোলার গৌরব ছিল প্রমথনাথের। স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনিই স্থাপন করেছিলেন অনুশীলন সমিতি; এই অনুশীলন সমিতিই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। 'পি. মিত্র' ও 'অনুশীলন সমিতি'—এই নাম দুটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক ও অভিন্ন হয়ে আছে, সেইজন্যই বিস্মৃতপ্রায় এই বাঙালী সন্তানের জীবন-কথা এতখানি বললাম। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁর পরিকল্পিত অনুশীলন সমিতির ইতিহাস আলোচনা করব।

১৮৮৮।

বর্ণাঢ্য উনিশ শতক শেষ হতে তখন আর মাত্র কয়েক বৎসর বাকী।

সেই শতাব্দীর অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র যেন সেই সময় সমগ্র শতাব্দীর জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আগামী কালের জন্য বাঙালীকে যদি সকল বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তার জন্য একটি নূতন আদর্শের প্রয়োজন। তাঁর ছিল ঋষির দৃষ্টি আর ঐতিহাসিকের মন। তিনি বুঝেছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর বহু-ভঙ্গিম নবজাগৃতির প্রাণগঙ্গা বাঙালীর সমাজ-জীবনের দুই তট দিয়ে যেভাবে প্রবল তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে তার একটা ঐতিহাসিক পরিণতি অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী। বিংশ শতকে সেই নবজাগৃতির স্রোতোধারা কোন্ বাঁকে প্রবাহিত হবে, সেটা তাঁর দৃষ্টি-পথে সুনিশ্চিতভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই তো তিনি ভাবী কালের বাঙালীর জন্য যুগোপযোগী একটি আদর্শের কথা গভীরভাবেই চিন্তা করলেন। তাঁর এই চিন্তারই ফলশ্রুতি ছিল 'ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন)' —যা তিনি মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্বে, ১৮৮৮ সনে প্রকাশ করেন।

'ধর্মতত্ত্বের' আগে তিনি লিখেছেন 'আনন্দমঠ'। এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে তিনি দেশাত্মবোধ ও সন্তানধর্ম প্রচার করেছেন; বলেছেন —দেশপ্রেমের চেয়ে আর বড় ধর্ম নেই। আর এই উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম্' গানের ভিতর দিয়ে তিনি এঁকেছিলেন দেশজননীর একটি পরিপূর্ণ মূর্তি। এইবার তিনি মানবজীবনের ব্যাপকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। রচনা করলেন নব মানবতাবোধের গীতা। এই মানবতাবোধের আদর্শটাই তিনি বিংশ শতকের বাঙালীর জন্য রেখে গেলেন তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের মাধ্যমে। এইবার তিনি মনুষ্যত্বকেই

মানুষের ধর্ম বলে ঘোষণা করলেন। এই নূতন আদর্শকে সম্বল করে, এই নূতন অনুশীলন মন্ত্রের সাধন করেই তো বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বাঙালী তরুণ অগ্নিযুগের সৃষ্টি করেছিলেন। 'মনুষ্যত্ব সাধনই মানুষের একমাত্র ধর্ম'—বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বের এইটাই হলো মর্মকথা।

বঙ্কিমের জীবনদর্শনকে বাঙালীর জীবনদর্শন করে তুলবার জন্য একটি বিশেষ মানুষের প্রয়োজন ছিল। সেই মানুষ ছিলেন পি. মিত্র। তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঋষি বঙ্কিমের কল্পনাকে সার্থক করতে হলে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ প্রয়োজন। এই দুইটি বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ভিন্ন মনুষ্যত্ব অর্জন আদৌ সম্ভব নয়; আর প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে না পারলে জাতীয়তাবোধের কোন সার্থকতা নেই। সে যুগের সকল বিপ্লবী শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন করে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে বীরদর্পে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্যারিস্টার মিত্রের মস্তিষ্ক যখন এইরকম চিন্তায় ভরপূর, তখন যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়েছিল, সেটি এখানে উল্লেখ্য।

১৯০০ কি ১৯০১ সনের কথা।

তখনো স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়নি।

উনিশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে আর একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনতে পেলাম: "সব রকম দুর্বলতা পরিহার করে তোরা সব মানুষ হ, মরদ হ।" এই ছিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিদায় বাণী—এই বাণী দিয়েই তিনি বিংশ শতকের বাঙালী তরুণদের অভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আসন্ন মাতৃপূজার জন্য বাঙালী যুবকদের তৈরি হওয়ার জন্য তিনি যেভাবে ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনটি বুঝি আর কেউ পারেন নি। ঠিক এই সময়ে, স্বামীজির মহাপ্রয়াণের এক বছর আগে ভারত-ভ্রমণে এলেন জাপানী পরিব্রাজক ওকাকুরা। বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে পি. মিত্রের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন ভারতসভা হলে এক

আলোচনা বৈঠকে ওকাকুরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হন। সেই বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে এই জাপানী শিল্পসমালোচক বিশেষ তীব্রতার সঙ্গে বলেছিলেন: "আপনারা এতবড় একটা শিক্ষিত জাতি, কেন ইংরেজের পদানত হয়ে থাকবেন? স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য অথবা গুপ্তভাবেই হোক বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা আরম্ভ করুন।" সেই আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন হালদার, ভূপেন বসু, অরবিন্দ ঘোষ এবং পি. মিত্র। ওকাকুরার কথাগুলি সকলের অন্তর স্পর্শ করল, বিশেষভাবে মিত্তির সাহেবের। এই ইঙ্গিতটুকু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

১৯০২। দোল পূর্ণিমা।

স্থান—২১ নম্বর মদন মিত্রের গলি।

শহরের রাজপথে আবীরের ধূলা, পিচকারিতে রঙের ফোয়ারা, আনন্দে উদ্বেলিত নর-নারী। সেই উৎসবের অন্তরালে শহরের এই অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে ভাবীকালের বাঙালী তরুণদের মনের আকাশ স্বদেশপ্রেমের অনুরঞ্জনে রঞ্জিত করে তোলার যে আয়োজন হয়েছিল, সেদিন শহরের উৎসবমত্ত নর-নারীর নিকট তার বার্তা গিয়ে পৌঁছয় নি। বাছাই করা মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন এইখানে; তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দুইজন—পি. মিত্র ও সোদপুরের শশীভূষণ রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম করতে হয়। তিনি সতীশচন্দ্র বসু। সতীশচন্দ্র ছিলেন জেনারেল এসেম্‌ব্‌লী কলেজের সংশ্লিষ্ট ব্যায়ামাগারের একজন বিশিষ্ট কর্মী। শশীভূষণ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখতেন; তিনি কাজ করতেন গ্রামে। তিনিও এইরকম একটা সমিতি গঠনের কথা সেই সময়ে চিন্তা করছিলেন।

সমিতি স্থাপনের আগে এর নাম নিয়ে আলোচনা হয়। মিত্তির

সাহেব নারিকেলডাঙায় স্যর গুরুদাস ও গ্রে স্ট্রীটে সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবিতকালে মুখ্যত স্যর গুরুদাস, রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জি ও ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ংমেন'। পরবর্তী-কালে এই সোসাইটি 'ইউনিভারসিটি ইনস্টিস্ট্যুট' নামে পরিচিত হয়। তারো আগে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল ছাত্রসভা। তিনিই তখন দেশের যুবকদের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের ক্রান্তিকালেই বাংলার বিশিষ্ট জননায়কগণ বাংলার তরুণ সমাজকে নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে একটি বিশেষ পথে তাদের পরিচালিত করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁদের সেইসব প্রয়াস অনেক পরিমাণেই সার্থক হয়েছিল। এই ধারাপথেই বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে অনুশীলন সমিতির জন্ম যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। তখনকার দিনে বাঙালীর এমন কোন শুভ প্রচেষ্টা ছিল না যা স্যর গুরুদাসের আশীর্বাদলাভে ধন্য না হয়েছে; দেশের কল্যাণকর সকল প্রয়াসের সঙ্গেই তিনি সংযুক্ত ছিলেন। সুতরাং অনুশীলন সমিতিও তাঁর আশীর্বাদ ও সমর্থন দুই-ই লাভ করেছিল।

পি. মিত্র যখন তাঁদের সংকল্পের কথা স্যর গুরুদাসকে বলেন তখন তিনি বলেছিলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এইরকম একটি সমিতি গঠিত হতে চলেছে, তাতে আমার বিবেচনায় বঙ্কিমবাবুর 'অনুশীলন' নামটি গ্রহণযোগ্য।

অনুশীলন!

পি. মিত্র কথাটি বারবার আপন মনে আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগলেন। এর চেয়ে যোগ্য নাম আর কিছু হতে পারে না, তিনি ভাবলেন। সারদাচরণও ঐ নামটি সমর্থন করলেন। নাম

তো নয় যেন একটি বীর্যপ্রদ মন্ত্র। এই অনুশীলন মন্ত্রেই তিনি বাঙালী তরুণদের উদ্বুদ্ধ করবেন। মদন মিত্রের লেনে সেই দোল-পূর্ণিমার পুণ্যক্ষণে স্থাপিত হলো অনুশীলন সমিতি। সমিতির কার্যালয় পরে ৪৯ নম্বর কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। সমিতি স্থাপিত হলো এবং সকলেই পি. মিত্রকে এর অধিনায়ক মনোনীত করলেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতৃত্বপদে বরণ করা হয়েছিল, কারণ এই জাতীয় একটি প্রয়াসকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে যে ব্যক্তিত্ব, সাহস ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, প্রমথনাথের মধ্যে তা ষোল আনাই ছিল। সকলের উপর ছিল ত্যাগ। সে যুগের বাংলায় এমন ত্যাগী পুরুষ বিরল বললেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে যে সন্তানধর্মের উল্লেখ করেছেন তার মূল কথাটাই ছিল ত্যাগ। এটা উপলব্ধি করেছিলেন পি. মিত্র বিশেষভাবেই। তাঁর ত্যাগের আদর্শ সেদিন অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। তাই সকলে তাঁকেই এই নব অভিযানে নেতারূপে বরণ করেছিলেন এবং তিনিও এই নবজাত সংগঠনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, এমন একটি মহৎপ্রাণ দেশপ্রেমিক বাঙালী সন্তানের কোন স্মরণ-সভা হয় না এদেশে।

শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক মনুষ্যত্ব অর্জন করার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হলো বাঙালী বিংশ শতাব্দীর উষাকালে। "হে গৌরীনাথ! আমাকে মনুষ্যত্ব দাও"—সন্ন্যাসীর এই আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। বাঙালী তরুণ অভিযান করল মনুষ্যত্বের বন্ধুর পথে—যে পথে শুধু কণ্টকের অভ্যর্থনা আর গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা। কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হওয়ার সংবাদ যখন বাংলার জেলায় জেলায় প্রচারিত হলো তখন জাতীয়তাবোধের যে উত্তাল বন্যা সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা এক কথায় অভূতপূর্ব। অথচ বাইরে এর প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস সামান্যই ছিল। মন্ত্রগুপ্তি ছিল এই সমিতির একটি বিশেষ বিধান। কথা নয়, কাজ—এই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। বাঙালী

যুবসমাজের মনকে এক নূতনভাবে পরিশীলিত করে তোলার জন্য ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণেই জন্ম নিয়েছিল এই অনুশীলন সমিতি। এর সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, জন্মলগ্নেই এই সমিতি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিল। তিনি এই তরুণদলকে কাজের অনেক উপদেশও প্রদান করেছিলেন। অনুশীলন সমিতির জন্মকালে এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যপদে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব যাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধ মল্লিক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সমিতির আখড়ায় লাঠি-ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। সতীশচন্দ্র বসু ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক। সমিতির প্রাথমিক খরচের টাকা এসেছিল স্বদেশপ্রাণ সুবোধ মল্লিকের তহবিল থেকে। ইনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে নয়, তাঁর স্বদেশবাসীর কাছ থেকে, যখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের জন্য এক কথায় একলক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনও এঁর গোপনদানে সেদিন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হওয়ার অল্পকাল পরেই স্থাপিত হয় গুপ্ত সমিতি। যে দুইজন বাঙালী সন্তান বাহুবলে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার কথা প্রথম চিন্তা করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অরবিন্দ ঘোষ আর দ্বিতীয় জন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের নিরালম্বস্বামী)। অরবিন্দ ঘোষের কথা সবাই জানে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজ বিস্মৃতির তলে অবলুপ্ত। এই শতাব্দীতে ভারত তথা বাংলা দেশে বিপ্লবের রণগুরু যদি হন অরবিন্দ তাহলে তার প্রথম সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে সংক্ষেপে এঁর কথা কিছু বলব।

প্রখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।

সেই আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে, "এঁর পূর্ব-আশ্রমের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃভিটা বর্ধমান জেলার খানা জংশনের কাছে চান্না গ্রামে। জন্ম ইংরেজী ১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭ সাল। তিরোধান ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল। পিতার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সরকারী চাকুরে; যশোহর ম্যাজিস্ট্রেটের পেশকার। যতীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ভারী দুর্দান্ত ছিলেন। ছেলেদের সর্দার; খেলাধূলা, ডানপিটেমিতে তাঁর সময় বেশ কাটত। পড়াশুনায় যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না ভেবে পিতৃদেব চিন্তাকুল হয়ে পড়েন....মায়ের সস্নেহ পরিচালনায় দুষ্ট বালক ক্রমে শিষ্ট হল। গ্রামের পড়া শেষ করে শহরে পড়তে গেলেন। ক্রমে তিনি এম. এ. অবধি পড়েছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় বৈঁচি গ্রামে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে। যখন তিনি যুবক (যতীন্দ্রনাথ দেখতে সুদর্শন, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠদেহ ছিলেন ও বালক বয়সেই পিস্তল চালনায় দক্ষ ছিলেন।)—তখন ভেতো বাঙালী, ভীরু বাঙালীর দুর্নাম ঘোচানর নেশায় তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে বাঙালীর দুর্বিষহ দুর্নাম মোচনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ঈশ্বরলাভের জন্য বহুজন ঘরছাড়া হয়েছেন এদেশে। ইনি কিন্তু সিপাহী-জীবন লাভের জন্য গৃহছাড়া হলেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লব বা বিদ্রোহে ইংরেজকে তাড়াতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দি শেখার জন্য এলাহাবাদে 'কায়স্থ পাঠশালা'য় 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে লেখাপড়া করেন।

"শুধু সৈনিক হতে সাধ হলেই তো হবে না? সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া চাই। ইংরেজের সৈন্যদলে বাঙালীর স্থান নেই। তিনি দেশীয় রাজাদের সৈন্যদলে ঢোকার চেষ্টা করলেন। অবশেষে উপস্থিত হলেন ভরতপুর রাজ্যে। এখানে সুবিধা হল না। যতীন্দ্রনাথ বরোদায় উপস্থিত হলেন। বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ তখন মহারাজের খাস-সচিব। তাঁর সাহায্যে তিনি 'যতীন্দর

উপাধ্যায়' এই নামে বরোদার সৈন্যদলে ঢুকলেন। সাধারণ সৈন্য হয়েই ঢুকলেন এবং ক্রমে যুদ্ধের নানা-বিভাগীয় বিদ্যা আয়ত্ত করেন। অবশেষে তিনি হলেন মহারাজার শরীর-রক্ষক। লম্বাচওড়া চেহারা, অতি সবলদেহ, মুখে-চোখে প্রতিভার দীপ্তি। অরবিন্দ তাঁকে খুব ভালবাসতেন।....যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে অরবিন্দের কাছ থেকে সরলা দেবীর নামে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন। এখানে মিত্তির সাহেবের আনুকূল্য লাভ করেন এবং অনুশীলন সমিতির সঙ্গে পরিচিত হন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য সারকুলার রোডে সুকিয়া স্ট্রীট থানার কাছে একটি বাড়ি ভাড়া করে তিনি সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। এখানে একটি সমিতি স্থাপন করা হল। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবী-নীড়। এখানে ঘোড়দৌড়, সাইকেল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখানো হতো এবং বিপ্লবীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা ও পাঠচক্র পরিচালিত হতো। ভগিনী নিবেদিতা এটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথকে রাজনীতি শেখানোর জন্য বিপ্লববাদের অনেকগুলি বই দিয়েছিলেন।"

এই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের কাহিনীর নায়ক বাঘা যতীনের প্রথম পরিচয় হয় ১৯০৩ সনে যোগেন বিদ্যাভূষণের বাড়িতে; সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

"যতীনের কথা শুনেছ ?" ।

এই কথা একবার শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপর তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ধীর, গম্ভীর ও সংযত কণ্ঠস্বরে তিনি বলেছিলেন : "একটি অদ্ভুত আশ্চর্য মানুষ ! পৃথিবীর যে কোন দেশের মনুষ্যসমাজের প্রথম সারিতে তাঁর আসন। সৌন্দর্য ও বীর্যবত্তার এমন সম্মিলন আমি কখনো দেখিনি। একজন যোদ্ধার তুল্যই ছিল তাঁর দৈহিক উচ্চতা।"

শ্রীঅরবিন্দের এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি থেকে সেই বিপ্লবী নায়কের যে পরিচয় আমরা পাই, বাঘা যতীন সম্পর্কে আমাদের মনে তা একটি সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই অঙ্কিত করে দেয়। বাংলার বিপ্লবী সমাজে তাঁর যে একটি অনন্যলব্ধ স্থান ছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ নেই। একটি অখণ্ড বীর্যবত্তার শুচিশুভ্র বিগ্রহ-মূর্তি ছিলেন তিনি। সেই মূর্তি আজ আমাদের স্মৃতিপটে ম্লান। যখন আমরা এই মূর্তিকে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিকায় সংস্থাপিত করে নিরীক্ষণ করি তখন কি দেখতে পাই ? দেখতে পাই যে, মৃত্যুঞ্জয়ী এই বীর নায়ক ও তাঁর বিপ্লবী সহকর্মী চতুষ্টয় বালেশ্বর যুদ্ধে আত্মদান করে পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের জন্য আত্মোৎসর্গের একটা নূতন আদর্শ রেখে গেছেন। বাঘা যতীনের যা কিছু মহিমা, যা কিছু শৌর্য তার সবটাই বালেশ্বরের বুড়িবলঙ্গের তীরে ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই ক্ষণকালের উদ্ভাসন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চিরকালের সম্পদ হয়ে আছে।

বালেশ্বরের ইতিহাসটা কি ?

উড়িষ্যার সমুদ্রকূলে বিদেশ থেকে আসবে আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই-করা একখানা জাহাজ। সেই জাহাজ থেকে সেইসব অস্ত্র গ্রহণের পরি-

কল্পনা নিয়ে বাঘা যতীন সদলে ও সংগোপনে উপস্থিত হন সেখানে। কোন একটি সূত্রে সেই সংবাদ জানতে পেরে কলিকাতা থেকে একটি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তাঁদের অনুসরণ করে। এই বাহিনীর সঙ্গে সানুচর যতীন্দ্রনাথ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। একদিকে পাঁচজন, অন্যদিকে তার বিশগুণ। হয়ত আত্মসমর্পণ করলে তাঁরা বাঁচতে পারতেন, কিন্তু অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা করলেন সম্মুখ যুদ্ধ, দেখালেন আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা। এই বীরত্ব, এই আত্মদানই বাঘা যতীনের জীবনেতিহাসের মর্মকথা। সেই মহিমময় জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সহজ নয়। বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন, কারণ বাইরের ঘটনাবলীর মধ্যে সে-জীবনের অভিব্যক্তি সামান্যই দেখতে পাওয়া যায়। বাঘা যতীনের জীবনকথা ইতিপূর্বে কেউ কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে জীবন-চরিতের আধুনিক সংজ্ঞার মানদণ্ডে বিচার করলে পরে সেগুলির মূল্য বা উপযোগিতা সামান্যই। ঘটনার অন্তরালেই আবিষ্কার করতে হয়, বিপ্লবীর জীবন। বিপ্লবী-মানসের গতি-প্রকৃতি যেমন বুঝতে হয়, তেমনি বুঝতে হয় তার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ধারাপ্রবাহ। বুঝতে হয় কোন্ উৎস থেকে তাঁরা তাঁদের জীবনের পাত্রে আহরণ করেন আহিতাগ্নি। এঁদের জীবনকে নিয়ে কাহিনী ও কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের নয়, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে বিপ্লবীজীবনের প্রতিফলন কতটুকুই বা থাকে? বাঘিনী যেমন তার শিকার মেরে ফেলে ফিরে যাবার সময় তার লেজটি দিয়ে তার পায়ের ছাপ মুছে ফেলে, বিপ্লবীরাও তেমনি তাঁদের কীর্তিকলাপ মুছে ফেলতেই ছিলেন সমধিক আগ্রহী। তাঁদের আত্মত্যাগ তাই সার্থক হয়েছে তাঁদের আত্ম-অবলুপ্তির ভিতর।

বাঘা যতীনের আশ্চর্য জীবনটাও ছিল এমনি আত্মত্যাগ আর আত্ম-অবলুপ্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন বলে জানা যায় আর ধর্মজীবনে তিনি গুরুরূপে এমন এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে বরণ করেছিলেন যাঁর

হাতের মুঠোর মধ্যে বিধৃত ছিল সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ক্ষমতা। শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরিমহারাজের শিষ্য হওয়ার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল। আবার তিনি জননী সারদা দেবীর স্নেহ ও আশীর্বাদ দুই-ই লাভ করেছিলেন। কাজেই বাঘা যতীনের জীবনেতিহাস আলোচনা করতে হলে বহিরঙ্গ ঘটনা অপেক্ষা তাঁর অন্তরজগতের উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। তাঁর পূর্ববর্তী জীবনীকারদের মধ্যে কেউ এটা করেছেন বলে আমার মনে হয় না। ইতিহাস যেমন, আর্ণল্ড টয়েনবি ও ক্রোচের মতে, কেবলমাত্র সন-তারিখের ফিরিস্তি নয়, বা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণ মাত্র নয়, তেমনি প্রকৃত বিপ্লবীর জীবনও কয়েকটি ঘটনার সমষ্টি নয়, তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি। বালেশ্বর যুদ্ধের নায়কের জীবন বা তাঁর সহকর্মী চতুষ্টয়ের জীবন ছিল দেশাত্মবোধের আগ্নেয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ। উপনিষদের সঙ্গে এইসব জীবনের তুলনা করা চলে—এখানে সব কিছুই বর্ণিত হয়েছে সূত্রাকারে। সেইসব সূত্র অবলম্বন করে আমরা এই বীর যোদ্ধার জীবনকথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

১৮৮০।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত কয়াগ্রাম।

এইখানে থাকতেন একটি শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার। তাঁদের উপাধি চট্টোপাধ্যায়। এই চাটুয্যেরা ছিলেন বাঘা যতীনের মাতুল বংশ। তাঁর বড়মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের একজন সরকারী উকিল। বলতে গেলে তখনকার দিনে কৃষ্ণনগরে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—সম্মানে এবং প্রতিষ্ঠায়। বিত্তশালী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সঙ্গতিসম্পন্ন। দানে ছিলেন মুক্তহস্ত, দরিদ্রের উপকার করতে সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর এই

মাতুলের অনেক সদগুণ বাঘা যতীনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। মেজমামা হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডাক্তার। তিনি থাকতেন কলিকাতার শোভাবাজারে। তখনকার দিনে এল. এম. এস. পাশ করা ডাক্তার হলেও তাঁর পশার ছিল যথেষ্ট এবং তিনি উপার্জনও করতেন প্রচুর। ইনিও তাঁর জ্যেষ্ঠের মত ছিলেন পরোপকারী ও বদান্যপ্রকৃতির লোক। হেমন্তবাবুর বাড়িটা ছিল যেন একটা ধর্মশালা—দেশের সকল লোকের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। তাঁর ছিল মাত্র দুটি পুত্র—কিন্তু তাঁর কলিকাতার বাসায় থেকে গ্রামের অনেকগুলি ছেলে, কেউ স্কুলে, কেউ বা কলেজে লেখাপড়া করত। বস্তুত কয়াগ্রামের গৌরবস্বরূপ ছিলেন এই দুই মহৎপ্রাণ বাঙালী সন্তান—বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার। তাঁর শৈশবজীবনে এই দুই মাতুলের জীবনাদর্শ থেকে ভাগিনেয় যতীন্দ্রনাথ যে তাঁর চরিত্রগঠনের উপাদান পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই কয়াগ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮০ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ডিসেম্বর, ১৮৭৯) জন্মগ্রহণ করেন বাঘা যতীন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ও একমাত্র পুত্র। যতীন্দ্রনাথের একটি মাত্র দিদি ছিলেন ; নাম বিনোদবালা। মুখুয্যেরা ছিলেন যশোহরের অধিবাসী। এই জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড থানায় বিশখালি গ্রামে এঁরা বাস করতেন। যতীনের পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্রহ্মত্তোরভোগী একজন ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই অঞ্চলে নীলের চাষ হতো। নীলকুঠির সাহেবদের তখন ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। সবাই তাঁদের ভয়ে তটস্থ থাকত। এই নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের ফলেই বাংলাদেশে প্রথম গণ-বিদ্রোহ, নীলকর আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে চিরকালের জন্য বিজড়িত হয়ে আছে তিন জন বাঙালী সন্তানের নাম—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁদের

সঙ্গে আরো একজনের নামের উল্লেখ করতে হয়—পাদ্রী লং সাহেব। হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হতো। দীনবন্ধু মিত্র সেইসব বিবরণকে তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটকে রূপ দিলেন আর মাইকেল ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের এই যুগান্তকারী নাটক। সেই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন পাদ্রী লং সাহেব। কুঠিয়াল সাহেবরা মামলা এনেছিল হরিশ্চন্দ্র ও লং সাহেবের বিরুদ্ধে। বাংলা নাটকে দীনবন্ধুর নামের উল্লেখ ছিল না বলে সাহেবরা তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করতে পারেন নি।

নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসটা এখানে বলা দরকার।

এই বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫১ সনে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশ থেকে যে-সব পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করতো তার মধ্যে নীল ছিল একটা। বাংলাদেশে নীলচাষের একচেটিয়া অধিকার ছিল কোম্পানীর। কোম্পানী যখন নীল চাষ করা থেকে বিরত হলো, তখন অনেক ব্যবসায়ী ইংরেজ এই চাষে মন দেয়। এদেরই বলা হতো নীলকুঠির সাহেব, নীলকর সাহেব বা কুঠিয়াল সাহেব। খুব লাভের ব্যবসা ছিল এই নীলের চাষ। তাই নীলকর সাহেবরা বেশী নীল উৎপাদনের জন্য চাষীদের উপর করতো অকথ্য অত্যাচার। নীল-কুঠিয়াল সাহেবদের সবাই ভয় করতো—দারোগা, পুলিশ, জমিদার, গাঁতিদার, চাষী—সকলেই। ধানের জমিতে জোর করে নীল বোনাতো। প্রজারা আপত্তি করলে শুনত না। তখন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হলো প্রকাণ্ড বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভ ক্রমে রূপান্তরিত হয় তীব্র আন্দোলনে। ইতিহাসে এরই নাম নীল আন্দোলন বা নীল-বিদ্রোহ। বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ চাষী সেদিন একযোগে ধর্মঘট আরম্ভ করেছিল। ফলে নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীল-বিদ্রোহই ইংরেজ আমলের ভারতে প্রথম গণ-আন্দোলন।

বাংলাদেশে নদীয়া-যশোহর-খুলনা অঞ্চলে নীলের চাষ হতো; এই সব অঞ্চলে বহু কুঠি ছিল। এমন একটি কুঠি ছিল উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গ্রামের নবগঙ্গার তীরে সিদরে নামক গ্রামে। ঝিনাইদহ মহকুমার সবাই ভয় করত এই কুঠির শেরিফ সাহেবকে। "সাহেব যখন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতেন, যে কেউ তাঁর সামনে পড়ত, সকলেই মাথা নীচু করে তাঁকে সেলাম করত। শুধু মাথা নীচু করতেন না সাহেবের কাছে এই মুখুয্যে মহাশয়। সে-যুগে এ রকম প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্ধর্ষ নীল-কুঠিয়াল সাহেবের কাছে যে মাথা নীচু হতো না, সে মাথা যে কতখানি উঁচু ছিল আর তার অধস্থ মেরুদণ্ডটি যে কতখানি শক্ত ছিল, আজকের দিনে তার যথার্থ ধারণা করা কঠিন।"

পিতার এই তেজ পুত্র যতীন্দ্রনাথের মধ্যে ষোল আনা দেখা গিয়েছিল। তাঁরও মাথা ও মেরুদণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তি ভাঙতে বা নোয়াতে পারে নি। সেইজন্যই বুঝি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"যতীন একটি আশ্চর্য মানুষ।" শক্তিতে, সাহসে ও বীর্যবত্তায় তিনি ছিলেন সত্যিই অতুলনীয়। উমেশচন্দ্র খুব অল্প বয়সেই মারা যান। তখন তাঁর বিধবা পত্নী শরৎশশী দেবী নাবালক পুত্র যতীন ও নাবালিকা কন্যা বিনোদবালাকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। উন্নত আদর্শের হিন্দু মহিলার প্রতিমূর্তি ছিলেন শরৎশশী; কবিত্ব-প্রতিভার সঙ্গে আরো অনেক গুণ ছিল তাঁর। স্বামী ছিলেন ব্রহ্মোত্তর-ভোগী ব্রাহ্মণ; সম্বল বলতে তাঁদের কিছুই ছিল না। বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার দু'জনেই তাঁদের বোনকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর এই বিপদের সময় স্বভাবতই তাঁরা স্থির থাকতে পারলেন না। নাবালক ভাগিনেয় ও নাবালিকা ভাগিনেয়ীকে মানুষ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা। তাদের নিয়ে বোনকে কয়াগ্রামে চলে আসতে অনুরোধ করলেন তাঁরা। উমেশচন্দ্রের মৃত্যুকালে যতীনের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর।

শরৎশশী পেলেন ভাইদের আশ্রয়।

নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

পুত্রের মুখ চেয়ে সহায়-সম্বলহীনা বিধবা বুক বাঁধলেন। স্বামীর শোক ভুলে তিনি ছেলেটিকে মানুষ করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পিত্রালয়ে তাঁর এবং তাঁর পুত্র-কন্যার আদর-যত্নের এতটুকু ত্রুটি হলো না। অতঃপর সংসারের সকল দায়িত্ব অগ্রজরা অর্পণ করলেন তাঁদের বিধবা সহোদরার উপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, উত্তরকালে যে তুর্জয় সাহস, ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম-পরায়ণতার জন্য বাঘা যতীন বিপ্লবী সমাজের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই। যে বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এইসব বিবিধ গুণের অধিকারী অনেকেই ছিলেন। আর যে নৈতিক শক্তির প্রকাশ সেই বিপ্লবী-বীরের চরিত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার অনেকটাই তাঁর মধ্যে কিশোর বয়সেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর পিতা-মাতা ও আদর্শ-চরিত্র মাতুল তুইজনের কাছ থেকে। বংশগরিমা না থাকলে কেউ কখনো বড় হয় না। পারিবারিক ঐতিহ্য আর উন্নত পারিপার্শ্বিক—এরই ফলে গঠিত হয় চরিত্রের বনিয়াদ। এদিক দিয়ে বাঘা যতীন যে বিশেষ সৌভাগ্যবান ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাঘা যতীনের জন্মকালের পারিপার্শ্বিকটা কিরকম ছিল, সেটাও আমাদের একটু জানা দরকার। তাঁর জন্মকাল ১৮৮০। বাংলার নবজাগরণের তখন পূর্ণ পরিণত অবস্থা। সাহিত্যের সকল দিক—কাব্য, নাটক ও উপন্যাস তখন অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও জাগ্রত হতে আরম্ভ করেছে। সমাজজীবনে একের পর এক দেখা দিয়েছে ভাব-বিপ্লব। বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তখন বাঙালীর ভাবজীবনের উপর নেতৃত্ব করছেন

অপ্রতিহত প্রভাবে। একা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথই তখন রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড ভাব-বন্যার সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে একটি নূতন মানস-মণ্ডল রচিত হয়ে চলছিল। তাঁরই হাতে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী রাজনৈতিক দীক্ষা লাভ করেছিল, বলা চলে। তার আগে শেষ হয়েছে বিদ্যাসাগরের সমাজ-বিপ্লব, যার ফলে উদার মানবিকতার পথে বাঙালী অনেকখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল। সেই একই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ধর্মজগতে এসে গিয়েছে সংস্কারের প্রবল বন্যা। আর এর মাঝখানে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে এক অর্ধশিক্ষিত হিন্দু সাধক আপন মনে সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা করে চলছিলেন। হিন্দুধর্ম তখন বেদান্তের উদার বাণীর ভিত্তিতে পুনরুত্থানের অপেক্ষায় আর সেই অভ্যুত্থানকে যিনি বিশ্বব্যাপী করে তুলবেন সেই বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী তখন সবেমাত্র এই মাতৃসাধকের সান্নিধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন।

এই ছিল সেই ১৮৮০ সনের বর্ণাঢ্য পারিপার্শ্বিক আর সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শহর কলিকাতা থেকে বহু দূরে গড়াই নদীর তীরে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীঅরবিন্দ-কথিত ভাবীকালের আশ্চর্য মানুষ বাঘা যতীন। সেই গড়াই নদীর তীরেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন। এই বিচিত্র পারিপার্শ্বিক থেকেই এই শিশু যে তার প্রাণরস আহরণ করে নিয়তি-নির্দিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। ১৮৮০ সনের বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে যিনি ছিলেন সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই কয়াগ্রামের এই শিশু, যশোহর জেলার মুখুয্যেবংশের রত্ন যতীন্দ্রনাথ অসাধ্য সাধন করেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বৎসর বয়সে। শ্রীঅরবিন্দ মিথ্যা বলেন নি, যতীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। তাঁর এই উক্তির সূত্র ধরেই আমরা বিপ্লবী-নায়কের জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করব।

শরৎশশী খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন।

ভাগ্যের উপর কারো হাত নেই, তাই ভগবানের এই বিধান তিনি মাথা পেতে নিলেন। স্বামীর অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল সুখ, সম্বল, আশা তাঁর কাছে শূন্য ও অর্থহীন হয়ে গেল। তার উপর এই বিধবা নারী ছিলেন একেবারেই নিঃসম্বল। শুধু ছেলেমেয়ে দু'টির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে জীবনধারণ করতে হলো। স্বামীর বংশের বাতি এই যতি—তাঁর প্রথম সন্তান। এই ছেলেকে মানুষ করতে পারলে আবার যদি বিধবার ভাগ্যে সুখের দিন ফিরে আসে। শিবরাত্রির সল্‌তে এই পুত্র ; তাই শরৎশশী তাঁর মাতৃহৃদয়ের সকল স্নেহ, সকল উত্তাপ দিয়ে একে ঘিরে রাখতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে উমেশচন্দ্র তাঁর সহধর্মিণীকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, "মুখুয্যে বংশের ইতিহাসটা তো জানো, বড়বৌ, আর তোমাদের বংশ-গৌরবের কথাও কিছু জানো। এই দুই বংশের পূর্বপুরুষদের বহু পুণ্যের ফল এই তোমার ছেলে। আমি এর ঠিকুজি বিচার করিয়েছি, দেখেছি যে এক ক্ষণজন্মা পুত্র আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে। পিতৃকূল ও মাতৃকূলের মুখই শুধু সে উজ্জ্বল করবে না, সেই সঙ্গে দেশেরও মুখ উজ্জ্বল করবে সে। পণ্ডিত রামময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের গণনা কখনো নিষ্ফল হয় না।"

একদিন দুপুরবেলায় তাঁর ঘরে বসে এই কথা ভাবছিলেন শরৎশশী। তখন তিনি ছেলেমেয়ে দু'টিকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্রয় ঠিক বলা চলে না, কেননা তাঁর অগ্রজ বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার দু'জনেই তাঁদের সহোদরাকে অসীম স্নেহের চক্ষে দেখতেন, সেকথা আগেই বলেছি। পুত্র এখনো ছেলেমানুষ, তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা আপাততঃ কয়াগ্রামের পাঠশালাতেই করা হয়েছে ; দাদা বলেছেন পরে তাকে কৃষ্ণনগরের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। যে কয়াগ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে

যতীন্দ্রনাথের শৈশবজীবন অতিবাহিত হয়েছিল, পদ্মা-তীরবর্তী সেই ছোট্ট গ্রামটি বড় মনোরম ছিল।

"গ্রামের পশ্চাতে তিন মাইল দূরে পদ্মা; সম্মুখে পদপ্রান্তে পদ্মার শাখানদী গড়াই। বর্ষাকালে গড়াই-এর মূর্তি হয় ভীষণা, ভয়ঙ্করী। তখন নদীতীরের ঘাটে-ঘাটে লোকে স্নান করে দলবদ্ধ হয়ে, কুমীরের ভয়ে কেউ একা জলে নামতে সাহস করে না। এমন কি একা তখন নদীর তীরে দাঁড়ালেও, নদীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে ভয়ে লোকের গা ছমছম করে। কিন্তু কয়াগ্রামের সেই অল্পবয়স্কা বিধবা রমণীটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি বর্ষাকালেও নিত্য স্নানে আসেন পাঁচ বছরের হৃষ্টপুষ্ট চঞ্চল ছেলেটিকে কোলে করে নির্জন ঘাটে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেন আর ছেলেটিকে সাঁতার শেখান। মাঝে মাঝে ছেলেটিকে জলে দূরের দিকে ঠেলে দেন আর অভয় দিয়ে বলেন: ভয় কি যতি, আরো এগিয়ে যা, আরো এগিয়ে যা।"

এই ছিলেন শরৎশশী দেবী।

বর্ষায় স্ফীতা যে গড়াই নদীর বুকে প্রবল তরঙ্গ আর আবর্ত, যার অসীম জলধারা ছুটে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, পদ্মার মতোই যে নদী বর্ষাকালে ভীষণ রূপ ধারণ করে, কুমীর ও হাঙ্গরে পূর্ণ থাকে, সেই গড়াই নদীতে নিঃশঙ্কচিত্তে সাঁতার শেখাচ্ছেন তাঁর একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পুত্রকে এক বিধবা জননী—এ দৃশ্য কল্পনা করলেও আমাদের মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এযে নিজের হাতে নিজের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। বাংলাদেশে সেকালে এমন মা ক'জন ছিলেন আমরা জানি না, তবে শরৎশশীর মতো এমন নিঃশঙ্কচিত্ত মা যে খুব বেশি ছিলেন না, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ভবিষ্যতে যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বেন, সেই যতীন্দ্রনাথের শৈশবজীবনের এই ঘটনাটি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সুন্দর ভাবেই সঙ্গতি বজায় রাখে না কি?

যখন কেউ তাঁকে বলত, তোমার প্রাণে কি ভয় নেই—এইটুকু ছেলেকে নদীর মাঝখানে ঠেলে দিচ্ছ, তখন শরৎশশী হেসে বলতেন—ও যে মরদ, গড়াই নদী তো সামান্য, ও একদিন পদ্মা-মেঘনা সাঁতরে পার হবে। বাঘা যতীনের উপযুক্ত গর্ভধারিণী বটে—নইলে এমন নির্ভীকতা কোন্ নারী দেখাতে পারেন? সত্যিই উত্তরকালের ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্তরে যিনি মহাত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, সেই চিরনির্ভীক বিপ্লবী নায়ক যে একজন আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে? শৈশবে দুরন্ত গড়াই নদীর তরঙ্গ-সমাকুল বুকে সাঁতার শেখা থেকে আরম্ভ করে বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে টেগার্ট-লোম্যানের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে আত্মবলি দেওয়ার দিনটি পর্যন্ত, এই বিপ্লবীর জীবনে বাঁকে বাঁকে আছে সহস্র রকমের বিস্ময় আর চমক।

পৃথিবীতে যাঁরাই বিধাতৃনির্দিষ্ট কোন একটি বিশেষ ভূমিকায় অংশ গ্রহণের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের বাল্যজীবনের আচার-আচরণ ও স্বভাবের মধ্যেই তার আভাষ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যতীন্দ্রনাথের জীবনেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তাঁর এক জীবনীকার (ইনি সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের মাসতুতো ভাই—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়) তাঁর শৈশবজীবনের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"মাতুলালয়ে ছোট যতি দিন-দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার কচি মনের উপরে পড়তে লাগল পারিপার্শ্বিকের ছাপ আর প্রভাব। বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল জেলাবোর্ডের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে সকালবেলাতে কুষ্টিয়া থেকে আসত ডাক-হরকরা কাঁধে ডাক-ব্যাগ বহন করে, দক্ষিণ হস্তে একটি সড়কি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হোত। তার সড়কির বাঁটে বাঁধা থাকত ঘুঙুর; দূর থেকে সেই ঘুঙুরের ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ শুনে যতি চকিত হয়ে উঠত আর ছুটে বাইরে বেলগাছটির তলে এসে দাঁড়াত। ডাক-হরকরা এই বেলগাছটির তলেই তার ডাক-ব্যাগ নামাত; কপালের উপর থেকে তার বিস্রস্ত ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ললাটের ঘর্ম মুছে ফেলত। যতি এসে, একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে ডাক-হরকরার সঙ্গে আলাপ করে নিত।"

বালকের মনে সহস্র কৌতূহল, সহস্র জিজ্ঞাসা।

কত দূর পথ অতিক্রম করে ডাক নিয়ে আসে কয়াগ্রামে এই ডাক-হরকরা। আখের ক্ষেত পেরিয়ে, শ্মশান ঘাট পেরিয়ে তাকে পথ চলতে হয়। ক্ষেতের মধ্যে থাকে কতো বুনো শুয়োর আর শ্মশানে থাকে কত ভূত-পেত্নী। ডাক-হরকরার কি ভয় করে না?

বালক ভাবে। তাই একদিন সে ডাক-হরকরাকে আচমকা জিজ্ঞাসা করল যদি কোনদিন বুনো শুয়োর তোমাকে তাড়া করে, অথবা যদি কোন দিন তুমি বাঘের সামনে আস, তখন কি হবে? শ্মশান ঘাটে ভূত-পেত্নীতেও তো সন্ধ্যেবেলায় তোমার ঘাড় মটকে দিতে পারে? তোমার ভয় করে না?

ভয়?

ডাক-হরকরা হেসে বলে, আজ দশ বছর ধরে এই কাজ করছি, ভয় করবে কেন? এই যে হাতে ইনি রয়েছেন—এই বলে সে তীক্ষ্ণ-শীর্ষ সেই লোহার বল্লমটা বালককে দেখিয়ে বলে—এই সড়কি যতক্ষণ তার হাতে আছে, ততক্ষণ বুনো শুয়োর, কি বাঘ, কি শ্মশানের ভূত-পেত্নী, কোন কিছুর জন্যেই তার ভয় নেই।

—তুমি ভূত বিশ্বাস কর? আচমকা জিজ্ঞাসা করে বালক।

—না দাদাবাবু। স্পষ্ট জবাব দেয় ডাক-হরকরা।

—কেন?

—আমি তো কোনদিন দেখিনি, আর যা কখনো দেখিনি, তার জন্যে ভয় করব কেন?

—কিন্তু সবাই যে বলে বিন্দীপাড়ার ঘাটের শ্মশানে ভূত-পেত্নী আছে, সন্ধ্যেবেলায় ওখানে গেলে তারা মানুষের ঘাড় মটকে দেয়।

—আমি এসব কিছু বিশ্বাস করিনে দাদাবাবু। ওসব লোকের বানানো গল্প।

যতির একটা কৌতূহলের নিরসন হলো।

ডাক-হরকরা যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই ভূত-পেত্নী বলে কিছু নেই। তবু সে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। সেদিন পাঠশালার ছুটির পর বাড়িতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সে তার মা-কে বলে, মা, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমি একবার বিন্দীপাড়ার ঘাটে যাব।

—কি জন্যে যাবি? ওখানে তো শ্মশান।

—ঐ শ্মশানঘাটেই যাব—দেখব ভূত-পেত্নী বলে সত্যি কিছু আছে কিনা।

—পারবি যেতে একলা? ভয় করবে না? কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা।

—না মা, আমি একলাই যাব। ভয় করবে কেন? তুমি আমার মাথা ছুঁয়ে দাও।

—কিন্তু সকাল সকাল ফিরে আসিস, আর কোথাও যাস না যেন, এই বলে শরৎশশী দেবী ছেলের মাথায় ডান হাতখানি রাখলেন কিছুক্ষণের জন্য। তুরন্ত গড়াই নদীর জলে যাকে তিনি সাঁতার শিখিয়েছেন, সেই তাঁর পুত্র যাতে অভিজিৎ হতে পারে, এই ছিল তাঁর অন্তরের নিভৃত কামনা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। যতি এসে দাঁড়াল বিন্দীপাড়ার ঘাটে। অদূরেই শ্মশান। চারিদিক নির্জন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। দু'একটা শেয়াল বিকট চীৎকার করে উঠল। ঘাটে মানুষ নেই। শ্মশানে একটি অর্ধদগ্ধ চিতার স্তিমিত আগুণের আলোয় কিছুটা অংশ স্বল্পালোকিত। দক্ষিণ-দিকটায় বট-পাকুড়ের নিবিড় বন। যতি স্বচ্ছন্দে কিছুক্ষণ সেই জনহীন শ্মশানে ঘুরে বেড়াল। ভয় তো দূরের কথা, তার গা এতটুকু ছমছম করল না।

আর একটি ঘটনা।

"গ্রামের প্রান্তে গড়াই নদীর ওপরে ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ের গড়াই ব্রিজ। ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলে যায়; বালকেরা বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। যতি মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে ভাবে—এই বিশাল অতল খরস্রোতা নদীর উপরে মানুষ কি করে এমন সাংঘাতিক মজবুত ব্রিজ গড়ে তুলল! সে

মাসীমা, পিসীমা, মামীমাদের জিজ্ঞাসা করে। তাঁরা গল্প করে শুনান সেই বিস্ময়কর কাহিনী। সাহেবরা এল ব্রিজ গড়তে, হাজার হাজার লোক লাগাল। খানিক গাঁথা হয়, আবার ভেঙে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভীষণ লড়াই। স্রোতের ধাক্কায় যখন গাঁথুনী ভাঙতে আরম্ভ করে, তখন মজুরেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। একবার মজুরেরা যখন এমনি করে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাহেব রেগে গিয়ে যারা পালাচ্ছিল, তাদের গুলি করে মেরে ফেলল।"

এমনি করে সাহেবরা নাকি পনর-কুড়ি জন মজুরকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। গড়াই নদীর সেতু তৈরির এই রোমাঞ্চকর কাহিনী কিশোর যতীনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। গড়াইয়ের জল যাদের রক্তে রাঙা হলো, যাদের কঙ্কাল গড়াইয়ের তীরের মাটিতে মিশে আছে তারাও তো এই গ্রামেরই নির্দোষী গরীব লোক ছিল। বিনাদোষেই তাদের এমনি করে গুলি করে হত্যা করল সাহেবরা। এই সব কথা যতীন যতই চিন্তা করতে থাকে, ততই যেন সে আক্রোশে ফুলে উঠতে থাকে। কিশোরের মনে জাগে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা—বড় হয়ে সে এর শোধ নেবেই।

—মাসীমা, আমি বড় হয়ে সাহেবদের মারব।

গল্প শোনার পর যতীন আচমকা এই কথা বলে উঠল। বড় মাসীমা পাশেই বসেছিলেন, মা-ও ছিলেন। বড় মাসীমা হেসে জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁরে যতি, সাহেবদের মারবি কেন?

—ওরা কেন নির্দোষী মজুরদের ঐভাবে গুলি করে মারল?

—ওরা রাজার জাতি, ওরা দেশের শাসক, ওরা যা খুশি তাই করতে পারে। এই কথা বললেন তার বড় মামীমা। যতীন তা মানতে চায় না। বলে—হলই বা রাজার জাতি, হলই বা দেশের শাসক, আমি এই অত্যাচারের শোধ নেবই। বড় হয়ে আমি সাহেবদের মারব। এই কথা বলতে বলতে কিশোরের চোখ দুটি

জ্বল জ্বল করে ওঠে ; তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে এক আশ্চর্য ভাব। তার মধ্যে যেন আভাসিত হয় ভাবীকালের বিপ্লবী-নায়কের ছবি।

ক্রমে কৈশোরে উপনীত হলেন যতীন্দ্রনাথ।

তাঁর তখনকার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর জীবনীকার এইভাবে : "দেহে তার জোয়ার বইতে শুরু হয়েছে। সুঠাম, বলিষ্ঠ, তেজোময় দেহ। পেশীগুলি বলিষ্ঠ সুপুষ্ট, আবেগে ঈষৎ চঞ্চল। ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বক্ষ, সিংহগ্রীবা ; সর্বদেহে পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গী, অপরূপ লাবণ্য এবং অজস্র শক্তির যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। প্রশস্ত ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ। দুটি ডাগর চক্ষু যেন রঞ্জিত হয়েছে অশনি-দীপ্তিতে। ছেলের দলের মধ্যে যতিকে দেখলে মনে হয়—যেন গুল্মরাজির মধ্যে উদয় হয়েছে এক বলিষ্ঠ ঋজু শিশু শালতরু।"

এ যেন মহাকাব্যের নায়ক।

শুধুই কি সুগঠিত দেহ? সেই সঙ্গে কিশোর যতীনের মনটিও গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্রভাবে। দুঃসাহসের টীকায় উজ্জ্বল তাঁর ললাট। একটা তেজ যেন ফুটে বেরুচ্ছে তার দুই চোখ দিয়ে। যে তেজস্বিতা বাঘা যতীনের উত্তরকালের চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যে তেজস্বিতা দেখে ইংরেজ রাজপুরুষেরা সন্ত্রস্ত থাকত, আর যে তেজস্বিতা বাংলার অগ্নিযুগকে একটা নূতন ব্যঞ্জনা দিয়েছিল, কিশোর যতীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই তেজস্বিতার পূর্বাভাষ দেখা গিয়েছিল। তেজস্বিতার সঙ্গে মিশেছিল দুঃসাহস। কয়াগ্রামে তখন এতবড় দুঃসাহসী ছেলে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর এই দুঃসাহস অভিব্যক্ত হতো নানা ভাবে—বিশেষ করে সাঁতার কাটা আর ঘোড়ায় চড়ার মধ্য দিয়ে।

যতীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনর বছর তখনকার একটি ফটো আছে। একটা শাদা ঘোড়ার পাশে লাগাম ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, পরিধানে মাল-কোঁচা মারা ধুতি, খালি গা। সেই দেহের

গঠন দেখে কেউ বলতে পারে না যে, সেই কিশোরের বয়স মাত্র পনর বছর। এমন সুন্দর সুগঠিত আর বলিষ্ঠ ছিল তাঁর চেহারা যা সচরাচর বাঙালীদের মধ্যে দুর্লভ। ভগবান যাঁকে দিয়ে একটি মহৎ কার্য সাধন করাবেন, তাঁকে বুঝি তিনি এমনি বলিষ্ঠদেহী করে গড়েছিলেন—যেন গ্রীক ভাস্করের খোদাই-করা একটি অপরূপ মূর্তি। তাই বুঝি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: "এমন সৌন্দর্য, এমন শক্তির সম্মেলন আমি কখনো দেখি নি।" বাঙালীও কখনো দেখেনি।

ঘোড়ায় চড়তে কিশোর যতীন্দ্রনাথ খুব ভালবাসতেন।

"বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলা বোর্ডের সোজা দীর্ঘ সড়ক, কুষ্টিয়ার পরপার থেকে কুমারখালি পর্যন্ত। সেই রাস্তা দিয়ে যতি ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে জিন নেই, মুখে লাগামও নেই। অশ্বের নগ্ন পৃষ্ঠে বসে আছে যতি, বাঁ হাতে ঘোড়ার গ্রীবার ঝুঁটি চেপে ধরে ডান হাত আন্দোলিত করে ঘোড়াকে উৎসাহ দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়েছে সে, রাস্তা দিয়ে চলেছে যেন একটা ঘূর্ণীবায়ুর মতো ছুটন্ত ধূলিরাশি, ঘোড়া বা ঘোড়ার সওয়ার ভাল করে দৃষ্টিগোচর হয় না—এমনি সেই ঘোড়-দৌড়।"

আজ যখন আমরা আমাদের কল্পনায় এই দৃশ্য দেখি তখন আমাদের মনে পড়ে প্রতাপ-শিবাজীর কথা আর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের কথা। ইতিহাসের এই বীরগণ সকলেই ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। কিশোর শিবাজী যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নক্ষত্রবেগে মারাঠার শৈলশৃঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, তখন একদিন জননী জিজাবাঈ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শিব্‌বা, তুমি এমনভাবে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াও কেন? উত্তরে কিশোর শিবাজী তাঁর মা-কে বলেছিলেন, আমি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করব মা, সেইজন্যেই এখন ঘোড়ায় চড়া শিখছি। তেমনি একদিন শরৎশশী দেবী তাঁর কিশোর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁরে যতি, তুই এমন

করে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াস কেন ? আমরা অনুমান করতে পারি যতীন্দ্রনাথ কী জবাব দিয়েছিলেন। হয়ত বলেছিলেন—আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করব বলে ঘোড়ায় চড়া শিখছি।

—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবি কেন ?

—ইংরেজ আমাদের দেশের শত্রু—তারা আমাদের পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে রেখেছে। এই বন্ধন আমি ছিন্ন করতে চাই।

—পাগল ছেলে আমার। এমন উদ্ভট চিন্তা তোর মাথায় কে দিল ?

—ভগবান।

—হ্যাঁরে যতি, তুই ভগবান মানিস ?

—খুব মানি মা। ভগবানই তো আমার অন্তরে দিয়েছেন এই সব চিন্তা, তিনিই তো আমাকে দিয়েছেন এই শক্তি আর সাহস।

ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলা, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার-কাটা প্রভৃতি কাজে যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে এই দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলেন এবং সেই বালক বয়সেই দুরন্ত ঘোড়াদের বশে আনতে পারতেন। বড় হয়ে তিনি যখন কৃষ্ণনগরে এসে তাঁর বড়মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করতে থাকেন, তখনও তাঁর মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার আগ্রহ সমানভাবেই বলবৎ ছিল। তাঁর মামার একটা চমৎকার আরবী-ঘোড়া ছিল। এই জাতের ঘোড়াগুলো সাধারণতঃ খুব তেজী। যতীন্দ্রনাথ সেই আরবী-ঘোড়া নিয়ে ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলেন। তাঁর মামার একটা বন্দুকও ছিল। সেই বন্দুক নিয়ে প্রায়ই তিনি শিকার করতে যেতেন। ঐ বয়সেই তাঁর হাতের নিশানা ছিল নির্ভুল। সাঁতার কাটতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। গড়াই নদীতে প্রায়ই

সাঁতার দিয়ে এপার ওপার হতেন, কখনো কখনো স্রোত ধরে বহুদূর চলে যেতেন।

"ভরা বর্ষার ভরা গড়াই নদী উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। পাঁচ-ছয় হাত উঁচু এক-একটা ঢেউ উঠছে আর সহসা যেন ফেটে গিয়ে বিরাট গর্জনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এর নাম মাথাভাঙা ঢেউ। যতি স্নান করতে নেমে মাঝ-দরিয়ায় চলে গিয়ে মনের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভাঁটিয়ে যেতে লাগল। নাগরদোলার মত যতি কখনো ঢেউয়ের তলায় ডুবে যাচ্ছে, কখনো বা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে। সাঁতার দিতে দিতে মাঝ-দরিয়া দিয়ে যতি চলেছে, দু'পাশে এক-এক মাইল দূরে-দূরে তট, সাঁতার দিতে দিতে যতি কয়া থেকে সাত মাইল দূরে কুমারখালি উঠল।"

এইভাবে ছেলেবেলা থেকে দৈহিক অনুশীলনের দিকে ছিল তাঁর বিশেষ মনোযোগ এবং এরই ফলে এক অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী তিনি হতে পেরেছিলেন। কলেজে পড়বার সময় হঠাৎ তাঁর খুব অসুখ হয়। এতকাল পর্যন্ত বিশেষ কোন অসুখ-বিসুখ তাঁর হয়নি বললেই হয়। সেই ব্যাধির আক্রমণে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে, সেই নিটোল স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। অসুখ সেরে গেল, পথ্য খেলেন। কিন্তু শরীরের বল যেন আর নেই। একদিন আয়নায় নিজের শীর্ণ দেহ দেখে তিনি যেন চমকে উঠলেন। যেমন করেই হোক ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতেই হবে। এই সময় তিনি চিন্তা করতেন কেমন করে আবার স্বাস্থ্যবান হবেন তিনি। একদিন তাঁর কলেজের এক সহপাঠী তাঁকে বললেন, যতীন তুমি অম্বুবাবুর আখড়ায় ভর্তি হও, সেখানে কুস্তি শেখ। তা' হলেই ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তিনি তাই করলেন। বিখ্যাত কুস্তিগীর অম্বু গুহের আখড়ায় যোগদান করলেন ও নিয়মিত কুস্তি করতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই যতীন ফিরে পেলেন তাঁর সেই আগের নিটোল স্বাস্থ্য আর হয়ে উঠলেন একজন দক্ষ কুস্তিগীর।

১৮৯৮।

যতীন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলেন।

তাঁর বড়মামা তখন তাঁকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সহোদর ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এই ছেলে যদি মানুষ হয় তবেই না তার বিধবা মায়ের দুঃখ ঘুচবে। তাঁর মামা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন সেন্ট্রাল কলেজে। শোভাবাজারে মামার বাসায় থেকেই তিনি কলেজের পড়াশুনা করতে থাকেন। যতীন এখানে এসে তাঁর মেজমামার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যায়। মামার তো মাত্র দুটি ছেলে, কিন্তু তাঁর শোভাবাজারের বাসাবাড়ি যেন ছেলেতে ভর্তি; তাদের কেউ স্কুলের ছাত্র, কেউ কলেজের। এযেন একটা সদাব্রত। কয়ার ছেলে বা কয়ার আশে-পাশের গ্রামের ছেলে বলে পরিচয় দিলেই হেমন্তকুমারের গৃহে তার স্থানলাভ সুনিশ্চিত ছিল।

শুধু কি আশ্রয়? "খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজের বেতন, সবই দেন ডাক্তারবাবু। এই সকল আশ্রিত ছেলেরা যা খায়, যা পরে, তাঁর নিজের ছেলে দুটিও তাই খায়, তাই পরে।" শুধু কি ছাত্র? দেশের কত লোক দরকারে কলিকাতায় আসেন আর তাঁরা এই বাড়িতেই তাঁদের দরকার মত বা ইচ্ছামত বাস করতেন, আহারাদি করতেন। এসব তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যতীন আরো বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন যে, তাঁর মেজমামাটি মানুষ নন, দেবতা। তাঁর আপন-পর ভেদজ্ঞান নেই। দেশের লোকজন শুধু যে তাঁর বাড়িতে এসে ওঠেন তা নয়, দরকার হলে তাঁরা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে টাকাও ধার নিতেন। কেউ শোধ দিত, কেউ দিত না, কিন্তু সেজন্য হেমন্তকুমারের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না।

—মামা, তুমি এইভাবে দেশের লোককে টাকা ধার দাও কেন? একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যতীন।

—কি বলিস যতি, ওরা আমার দেশের লোক, ওদের দরকারের

সময় ওরা যদি আমার কাছে হাত পাতে তা'হলে আমি কি না দিয়ে পারি। ভগবান আমাকে দিয়েছেন, আমি তাই পরের একটু উপকার করি।

—কিন্তু আমি ত দেখতে পাই ওদের অনেকেই টাকা নিয়ে আর উপুড়হস্ত করে না।

—তা না করুক। হয়ত পারে না বলেই করে না।

উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ তাই বলতেন, মেজমামা ছিলেন যেন দেবতা, তাঁর আত্মপর ভেদজ্ঞানই ছিল না। তাঁর এই মাতুলকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর কলেজ জীবনের অসীম সাহসিকতার একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে যতি কলকাতায় সেণ্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়ছেন তখন। একবার ছুটীর সময়ে সে কৃষ্ণনগরে বেড়াতে বেরিয়েছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, চারিদিকে তখন হৈ-হৈ শব্দ। দোকানীরা তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে; পথচারী মানুষ ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।...রাজবাড়ির একটা বিরাট ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, আর ইতস্তত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষিপ্ত অশ্বের ভয়ে সবাই রাস্তা থেকে পালাচ্ছে। যতি রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তার চারিদিক হতে শত শত ভয়ার্ত কণ্ঠের অনুরোধ আসতে লাগল: পালাও, পালাও।

"যতি পালাল না, দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উপরে। পরক্ষণেই দেখা গেল—দূরে সেই বিরাটকায় ক্ষিপ্ত তুরঙ্গম তীব্রগতিতে এইদিকে ছুটে আসছে। যতি তাড়াতাড়ি মালকোঁচা বেঁধে, শার্টের হাতার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে রইল। দুরন্ত অশ্ব দড়-বড় দড়-বড় শব্দে যখন নিকটে এসে পড়েছে, যতি

সহসা এক লম্ফে রাস্তার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়ে, তুই হাত প্রসারিত করে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আচম্বিতে সম্মুখে এইরূপ বাধা পেয়ে ঘোড়াটাও থমকে দাঁড়াল। অমনি যতি লাফিয়ে উঠে তার কপালের ঝুঁটি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল। ঘোড়া তখন শিষ-পা করে মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল আর ভীষণ ক্রোধে চিঁ-হি-হি রবে গর্জন করতে লাগল।"

সেদিন এই তুরন্ত ঘোড়াকে তিনি একাকী শায়েস্তা করে সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন। লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ে সরকারী উকিল বসন্তবাবুর ভাগ্নের অদ্ভুত সাহস আর শক্তির কথা। অভিনন্দিত হলেন তিনি প্রচুর ভাবে—কৃষ্ণনগরের মহারাজা, জেলা-শাসক ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একবাক্যে তাঁর এই সাহসিকতার জন্য ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। এই সাহসিকতার ছবি উত্তরকালে বাঙালী আর একবার দেখেছিল বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে। সেদিন টেগার্টের মতো লোককেই স্বীকার করতে হয়েছিল—"ভারতের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিকে আমি দেখেছি।"

তাঁর ছাত্রজীবনে যতীন্দ্রনাথ শুধু যে দৈহিক অনুশীলনে মনোযোগী ছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি শুধু ভীমের মতোই শক্তিধর পুরুষ হতে চাননি, সেই সঙ্গে মনের প্রসারতা যাতে বৃদ্ধি পায়, চরিত্র যাতে গড়ে ওঠে, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ইস্পাতের পেশীর সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলির স্ফুরণ। তিনি বুঝতেন যে, শরীর ও মন নিয়েই তো সমগ্র মানুষ। তাই শরীর-চর্চার দিকে তাঁর প্রবণতা যেমন ছিল, তেমনি আগ্রহ ছিল মানসিক উন্নতি-বিধানের জন্য, আর এই মানসিক উন্নতি লাভ করার জন্য যা যা করা দরকার তার সবই তিনি নিয়মিত করতেন।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে দেশ-বিদেশের ইতিহাসের গ্রন্থ আর স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, বীরদের জীবনকথা, এইসব তো পড়তেনই, সেই সঙ্গে আর একখানি বই বিশেষভাবে পড়তেন। সেটি হলো গীতা। কৃষ্ণনগরের স্কুলে তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় ব্যায়ামে প্রথম হওয়ার জন্য তিনখানি বই উপহার পেয়েছিলেন—যোগীন বসুর লেখা 'শিবাজী মহাকাব্য', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' আর গীতা। বড় মামাকে যখন তিনি প্রাইজগুলো দেখালেন তখন তিনি তাঁর ভাগিনেয়কে বলেছিলেন, গীতা হচ্ছে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ—এর মধ্যে একাধারে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে। যতীন কিন্তু এতসব যোগ-যাগের কথা বুঝতে চাইতেন না। নিজের মনে গীতা পড়তে পড়তে তিনি নিজেকে অর্জুনের আদর্শে একজন নিষ্কাম কর্মযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বাণী, বিশেষ করে যুদ্ধ-বিমুখ ও নৈরাশ্যগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য তিনি যে-সব

সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলেন, তার সবগুলো যতীনের হৃদয়ে যেন গেঁথে গিয়েছিল।

উত্তরকালে যখন তিনি বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করেছেন এবং ধীরে ধীরে নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন তরুণ বিপ্লবীদের তিনি আগেই জিজ্ঞাসা করতেন, গীতা পড়েছিস্? যদি না পড়ে থাকিস তাহলে এখানে আসিস না। যদি কেউ প্রতিবাদ করে বলত, কেন দাদা, বোমা-রিভলবারের সঙ্গে আপনার গীতার সম্পর্কটা কি? অমনি তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলতেন, এই কাজ যে করবি তার ইনসপিরেশনটা পাবি কোথা থেকে? যুদ্ধ করতে নেমে বিষাদমগ্ন অর্জুন যখন তাঁর গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আমার দ্বারা যুদ্ধ করা চলবে না, তখন তাঁকে তাতিয়ে-মাতিয়ে তোলার জন্যই তো শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন:

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

তাঁর মুখে তাঁর অনুচরগণ যখন এইসব কথা শুনতেন, তখন তাঁদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার হতো। বাঘা যতীনের সমস্ত জীবনটাই যেন গীতার মন্ত্রে সাধা ছিল।

'আনন্দমঠ' থেকেও তিনি কম প্রেরণা লাভ করেন নি।

তাঁর স্কুলজীবনে এই বইটি তাঁর এত প্রিয় ছিল যে, এটা তিনি বারবার পড়ে একেবারে মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। বলতেন, যে আনন্দমঠের সন্তানধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে নি, সে দেশপ্রেমের মর্ম কি জানে? যতীন্দ্রনাথ যখন স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, তখন 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়ে বাঙালীকে স্বদেশপ্রেমের একটা নূতন দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। জাতীয়তাবোধ তখন উন্মেষের পথে। বাঘা যতীন তো এই পরিবেশের মধ্যেই কৃষ্ণনগর ও কলিকাতা শহরে থেকে পড়াশুনা করেছেন।

'আনন্দমঠ' পাঠ করেই বাংলার একদল ডানপিটে ছেলে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে স্বদেশযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের সম্পর্কে অন্তত এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা এই বইটি পাঠ করে এর আদর্শটা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জীবনালোচনার সময় সেটি বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। ম্যাটসিনি বা গ্যারিবল্ডির জীবন তাঁদের যতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল, আমার বিশ্বাস, তার চেয়ে বেশি করেছিল আনন্দমঠের আদর্শ।

সে আদর্শটা কি ?

এর উত্তরে আনন্দমঠের উপক্রমণিকাটি আমাদের একবার স্মরণ করতে হয়।

সূচীভেদ্য অন্ধকারময় এক অরণ্যে রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে প্রশ্ন উঠল : "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?" একবার নয়, যখন তিনবার এই প্রশ্ন উঠল, তখন উত্তর শোনা গেল : "তোমার পণ কি ?" এরপর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখলেন তাই-ই পরবর্তীকালে রচনা করেছিল বাংলার বিপ্লবের বেদী :

"পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"

বোঝা গেল, স্বদেশ-সেবার জন্য শুধুমাত্র জীবন-দানই সব নয়। প্রথমে একনিষ্ঠ সাধনায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে, দেহে ও মনে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। তারপর দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলি দিতে হবে সেই প্রাণ। এই আদর্শটাই বঙ্কিমচন্দ্র পরে তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে আরো পরিস্ফুট করে লিখেছিলেন : "সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনই ধর্ম।" পরবর্তীকালে বঙ্কিমের এই আদর্শকেই কাব্যে রূপায়িত করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

....“শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সঙ্কট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।

....

....শুধু জানি
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।”

কবির এই কবিতাটি রচিত হয় ১৮৯৩ সনে, অর্থাৎ এই শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে। যতীন্দ্রনাথের বয়স তখন পনর-ষোল। এই বয়সটাকে আমরা বলে থাকি সেই বয়স যে বয়সে কোন একটা ভাবের ছাপ সহজেই আমাদের মনের মধ্যে পড়ে থাকে। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর কৈশোর। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলেজে যখন প্রবিষ্ট হন তখন উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে আর মাত্র ছুটি বছর বাকী ছিল। এরই মধ্যে দেশে যুব-শক্তির উদ্বোধন হয়ে গেছে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথের প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতাবলীর মাধ্যমে। কিন্তু সেই সময়টি বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে আরো একটি ঘটনার জন্য এবং সেই ঘটনাটি যে ভবিষ্যতের বিপ্লবী-নায়ক বাঘা যতীনের মনে একটি গভীর দাগ কেটেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। যতীন্দ্র-মানসের অনুধাবনের পক্ষে সেই ঘটনাটির এখানে উল্লেখ করা দরকার। বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন গৈরিক পতাকার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন সচকিত হয়ে উঠেছিল এই একটি মাত্র ঘটনায়। বাঙালী—পরাধীন বাঙালী যে

অসাধ্য সাধন করতে পারে, তার প্রমাণ রাখলেন এই তরুণ সন্ন্যাসী। মদগর্বী ও ধনগর্বী পাশ্চাত্য জগতকে তাঁর পায়ের তলায় এনেছিলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। সেইদিনই বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, ভারতের সুদিন আর বেশি দূরে নয়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তার পরিধি ছিল পঞ্চাশ বছর, এবং তার মধ্যেই এসে গিয়েছে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

ভারতে ফিরে আসার পর ভারতপ্রেমিক এই সন্ন্যাসীর উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হলো সেই অভিনব উদাত্ত আহ্বান: "হে ভারত! ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" তিনি আরো ঘোষণা করলেন—"আজ থেকে পঞ্চাশ বছর কাল আর কোন দেব-দেবী তোমাদের উপাস্য নয়, উপাস্য শুধু জননী জন্মভূমি—এই ভারতবর্ষ।"

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের এই যে মৃত-সঞ্জীবনী বাণী, এর থেকেই প্রাণরস আহরণ করেছিলেন বাঘা যতীন এবং তাঁর সময়কার বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীরা। এই আদর্শেই তাঁরা সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই না তাঁরা প্রিয়জনের পরিহাস, আর পরিচিত ব্যক্তির অবজ্ঞা, বিজ্ঞজনের অবিশ্বাস—সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করে ধ্রুবতারাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এইসব মহাপ্রাণদের পদে পদে সহ্য করতে হয়েছে সংসারের প্রলোভন ও উৎপীড়ন, তাঁদের পায়ের তলায় বিঁধেছে প্রত্যহের কুশাঙ্কুর। তথাপি তাঁরা নিজেদের জীবনকে সমিধরূপে ব্যবহার করে জ্বেলেছিলেন হোম ও হুতাশন আর দেশপ্রেমের বেদীমূলে বলিদান দিয়েছিলেন সব কিছু ক্ষুদ্রতা আর দৈন্য। অগ্নিযুগের উদ্বোধন যাঁরা করেছিলেন, বাঘা যতীন প্রমুখ সেই সব বিপ্লবীরা প্রধানত

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গঠন করেছিলেন তাঁদের চরিত্র ও মানস-পরিমণ্ডল। এই তথ্যটা আমাদের বিশেষ-ভাবেই মনে রাখা দরকার।

যতীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের পারিপার্শ্বিকের প্রসঙ্গে এখানে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। ঘটনাটি যদিও ঘটেছিল বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে পুণায়, তথাপি সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর এর প্রতিক্রিয়া ছিল অনস্বীকার্য, এবং বাংলার ভাবী বিপ্লবীদের জীবনেও এই ঘটনাটি ছায়াপাত করেছিল, বলা চলে। ১৮৯৭ সনে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের জুবিলি উৎসব (এই বছর তাঁর রাজত্বকালের ষাট বছর ও ভারত শাসনের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়; এই উপলক্ষ্যে ভারতে হীরক-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হয়েছিল)। হয় তখন এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের হিসাবে এই দুর্ভিক্ষের ফলে চল্লিশ লক্ষ ভারতবাসীকে সাহায্য প্রদান করতে হয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুহারও যথেষ্ট ছিল।

ভিক্টোরিয়ার জুবিলি বছরে পুণা শহরে একসঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ দেখা দিয়েছিল। তখন মহারাষ্ট্রের নেতা বালগঙ্গাধর টিলক, আবার তিনিই তখন ভারতের সর্বজনমান্য অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় টিলক পুণার প্লেগ ও সেই প্লেগ নিবারণে সরকারী ব্যবস্থার কঠিন সমালোচনা করে কয়েকটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া তখন সমগ্র বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রের উপর পড়েছিল—পুণা শহরেই মহামারীর প্রকোপটা বেশি দেখা গিয়েছিল। প্লেগের প্রতিষেধক কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা পুণা শহরে এমন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে, তার ফলে জনসাধারণের মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। প্লেগ দমন করতে গিয়ে সরকার যা কাণ্ড করলেন জনসাধারণের মনে তার তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণ এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। হিন্দুর

অন্তঃপুরের শুচিতা পর্যন্ত বাদ যায় নি। পুণার অধিবাসিগণ তখন সেই কারণে এতদূর উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, প্লেগ কমিটির সভাপতি র‍্যাণ্ড সাহেব ও প্লেগ অফিসার লেফটেন্যাণ্ট আয়ার্স্ট প্রকাশ্যে নিহত হন।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ১৮৯৭ সনের ২৭ শে জুন মধ্যরাত্রে। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট তখন রাজভবনে অনুষ্ঠিত জুবিলি ভোজসভা থেকে ফিরছিলেন। 'হিন্দুধর্ম সংঘ' নামে মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দামোদর চাপেকরের গুলিতে এই ইংরেজ দু'জন নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে পুণার বিশিষ্ট নাগরিক নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে নির্বাসিত করা হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে টিলক ধৃত ও অভিযুক্ত হন। টিলকের বিচারটাই তখন একটা বিশেষ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর মামলা পরিচালনার জন্য 'টিলক ডিফেন্স ফণ্ড' নামে একটি জাতীয় তহবিল খোলা হয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই জাতীয় তহবিল স্থাপন সেই প্রথম। বোম্বাই ও কলিকাতার অধিবাসিগণ এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন এবং এই দুই প্রদেশ থেকে টিলকের মামলা পরিচালনার জন্য সাতচল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। বাংলাদেশে এই চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অগ্রণী হয়েছিলেন। বিচার হয়েছিল বোম্বাইয়ের আদালতে। 'কেশরী' পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক কেশব রাও বাল ও পত্রিকা-সম্পাদক টিলক—এই দুইজন ছিলেন এই মামলার আসামী। বিচারে মুদ্রাকর নির্দোষী প্রমাণিত হন ও টিলক দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁর আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সখারাম গণেশ দেউস্কর সেই সময় 'টিলকের বিচার' নামে বাংলায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বইখানি বাংলাদেশের তরুণ বিপ্লবী সমাজে এক সময়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হতো।

টিলকের বিচার ও কারাদণ্ডের পর র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যার

নায়ক দামোদর চাপেকর ধৃত হন ও বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। যারবেদা জেলে ১৮৯৮ সনের ১৮ই এপ্রিল চাপেকরের ফাঁসী হয়। চাপেকরের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে যে আপিল করা হয়েছিল, জেলে বসে টিলক স্বয়ং তার মুসাবিদা করে দেন। এবং ফাঁসীর মঞ্চে উঠবার আগে চাপেকর যখন একখানি গীতা চেয়েছিলেন, টিলক তখন তাঁকে একখানি গীতা দিয়েছিলেন। জেলে তাঁর সঙ্গে তিনখানি গীতা ছিল। টিলকের কারাদণ্ড ও চাপেকরের ফাঁসি—এই ত্বটি ঘটনা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল। অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে সেদিন টিলক 'কেশরী' পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাই-ই এদেশের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই হিসাবে বালগঙ্গাধর টিলককে আমরা ভারতে বিপ্লবের আদিগুরুর গৌরব দিতে পারি।

টিলকের কথা এতখানি বলা হলো এইজন্য যে, যতীন্দ্রনাথ এঁর দেশপ্রেম দ্বারা সেই কিশোর বয়সে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে (১৯০৪) টিলক যখন কলিকাতায় এসে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন, তখন তরুণ যতীন্দ্রনাথ সেই উৎসবে যোগদান করেন ও শিবাজীর মূর্তির পাদপীঠে স্বহস্তে রক্তজবার অঞ্জলি প্রদান করেন। এই শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ সেই কবিতাটি মুখস্থ করেছিলেন ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে এটি তিনি বহুবার আবৃত্তি করে শোনাতেন। স্বর্গত অমরদা'র (প্রখ্যাত বিপ্লবী ও বাঘা যতীনের অন্যতম সহকর্মী উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) কাছে শুনেছি: "কলকাতায় এসে টিলক মহারাজ যখন শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন আমাদের মনে খুব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তারপর যখন তাঁর পরামর্শক্রমে শিবাজী-উৎসবের আয়োজন হয় তখন সেই উৎসব-সভায় যতীনদা

উপস্থিত ছিলেন। রবিবাবুর 'শিবাজী' কবিতাটির আবৃত্তি কবি-কণ্ঠে সেখানেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন এবং পরে এটি তিনি মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আবৃত্তি করে শোনাতেন। এই কবিতাটি সেদিনকার তরুণ বিপ্লবীদের খুব প্রিয় ছিল। যতীনদার মুখে যখন শুনতাম :

হে রাজ তপস্বীবীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এককণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর তরে
ভারতের ধন ॥

তখন আমাদের মধ্যে যে উন্মাদনা জাগত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।" এই শিবাজী উৎসবের কথা পরে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে বলব।

যে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক থেকে প্রাণরস আহরণ করে যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী-মানস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং সমকালীন যেসব ঘটনা একের পর একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে চলছিল, বাঘা যতীন তাঁর ছাত্রজীবনেই তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। আর এইসব ঘটনা ও পরিবেশ থেকে তাঁর জীবনকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না বলেই আমরা এইগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। মৃত্তিকাতলে প্রোথিত ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে রৌদ্র, বাতাস, ও সযত্ন বারিসিঞ্চনের ফলে যেমন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনি বহুবিধ প্রক্রিয়ার ফলেই তো বিপ্লবী-মানসের উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রম-পরিণতি লাভ ঘটে থাকে।

বাঘা যতীনের চার মাতুলের মধ্যে দু'জন ছিলেন খুব কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। জ্যেষ্ঠ মাতুল বসন্তকুমার কৃষ্ণনগরে সরকারি উকিল হিসাবে যেমন খ্যাতিমান ছিলেন তেমনি স্থানীয় কলেজের আইন-অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর ছিল খুব সুনাম। নদীয়া অঞ্চলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের অনেক জমিদারি ছিল এবং আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই ঠাকুর-পরিবারের 'জমিদার' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারিসূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসন্তকুমারের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল এবং তাঁদের এই অঞ্চলের যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে কবি বসন্তকুমারের পরামর্শই গ্রহণ করতেন। বসন্তকুমার ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের অন্যতম বাঁধা-উকিল। এই সূত্রেই শিলাইদহে ঠাকুর-পরিবারের কাছারি-বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। কথিত আছে, বালক যতীন্দ্রনাথ যখন কয়াগ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরের স্কুলে পড়তে আসেন তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের সঙ্গে তিনি একবার শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করেছিলেন। দশমবর্ষীয় যতীন্দ্রনাথকে দেখে কবি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বসন্তবাবু, এটি কে? যখন জানতে পারেন যে, ছেলেটি বসন্তকুমারের ভাগিনেয় তখন তিনি তাকে খুব স্নেহ করেন। বালকের প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি, নিটোল স্বাস্থ্য ও তেজোদৃপ্ত ভাব-ভঙ্গি দেখে কবি যারপর নাই মুগ্ধ হন। "আমি মশাই জ্যোতিষী নই, গণৎকারও নই, তবে আমার মন বলছে, উত্তরকালে আপনার এই ভাগিনেয়টি খ্যাতিমান হবে।"

কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী নিস্ফল হয়নি।

তাঁর মধ্যম মাতুল হেমন্তকুমারও কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে একজন নামকরা সার্জন ও জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন, একথা আগেই বলেছি। তাঁর বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন তখনকার দুইজন সবচেয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসক—ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী। শেষের ব্যক্তি ছিলেন তখনকার দিনের

সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন। এই ডাক্তার সর্বাধিকারীর চিকিৎসায় যতীন্দ্রনাথ বাঘের থাবার আক্রমণজনিত সাঙ্ঘাতিক ক্ষত থেকে আরোগ্যলাভ করেছিলেন, রোমাঞ্চকর সে-কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। তাঁর এই মাতুল দুইজনেই পরমস্নেহে পিতৃহীন এই ভাগিনেয়টিকে মানুষ করে-ছিলেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে যতীন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করার পর সিভিলিয়ান হন। যতীন যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন তখন বসন্তকুমার তাঁর সহোদরাকে একদিন বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা যতি বিলেত গিয়ে আই. সি. এস্. পড়ুক।

—তা কি করে সম্ভব, দাদা? আমার অবস্থা তো জান?

—সে ভাবনা তোর করতে হবে না। ওর বিলেত যাওয়ার এবং আই. সি. এস. পড়ার সব খরচ আমি দেব। তোর মত আছে কিনা তাই বল্।

শরৎশশীর অমতের কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর দাদাকে বোঝালেন যে, এনট্রান্স পাশ করার পর যতির একটা চাকরি যত শীঘ্র হয় তাঁর পক্ষে তত ভাল। কারণ এইভাবে ভাইয়ের সংসারে পুত্রকন্যা নিয়ে আর বেশিদিন থাকা তিনি পছন্দ করছেন না। তখন তাঁর দাদা তাঁকে বললেন, যতি এখনই চাকরি করবে কেন? আমরা তো তোর মাথার ওপর রইছি। তোর এত চিন্তা-ভাবনা কেন? এখন তো কলেজে পড়ুক। শরৎশশী দেবীর মনের চিন্তা তখন ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেটিও এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছে। এখন স্বামীর ভিটায় ফিরে যাওয়া তিনি কর্তব্য মনে করলেন। তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে ছেলে কলেজে পড়ে। তবু ভাগিনেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বসন্তকুমার তাকে কলিকাতায় তাঁর মধ্যম ভ্রাতার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ যথাসময়ে সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্তি হলেন।

যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ মাতুলের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। এঁর নাম ছিল ললিতকুমার। ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন ও সেই

হিসাবেই খ্যাত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ ও দেশপ্রেমিক যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের অন্যতম জামাতা। এই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সেদিন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে বাংলার তরুণদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলা ভাষায় ম্যাটসিনি ও গ্যারিবলডির জীবনী বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম এখনকার ছেলেরা জানে কিনা সন্দেহ। অথচ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন এদেশে প্রত্যক্ষ স্বদেশচেতনার উদ্বোধন করেন তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লেখনী সেই চেতনার প্রবাহকে কিভাবে তীব্র করে তুলেছিল তার প্রমাণ আছে 'আর্যদর্পণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং এই পত্রিকাতেই তিনি রাষ্ট্রগুরুর অনুরোধে নব্য ইতালির স্বাধীনতা-যজ্ঞের গুরু ম্যাটসিনির জীবনচরিত ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। তারপর পুস্তকাকারে উহা প্রকাশিত হলে ম্যাটসিনি-চরিত খুব সমাদর লাভ করে। যতীন্দ্রনাথ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল ললিতকুমার তাঁর প্রিয় ভাগিনেয়কে একখানি ম্যাটসিনি-চরিত ও একখানি গ্যারিবলডি-চরিত স্বহস্তে নাম লিখে উপহার দিয়েছিলেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে, উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ এই বই দু'খানি থেকেও স্বদেশপ্রেমের যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবকাল থেকেই শরীর-চর্চায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি যখন কৃষ্ণনগরে পড়তে আসেন তখন এই বিষয়ে ভাগিনেয়ের উৎসাহ দেখে মাতুল বসন্তকুমার ফিরাজ মিঞা নামে একজন পেশোয়ারী মল্লবীরকে মাইনে দিয়ে কিছুকাল তাঁর বাসায় রেখেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতুল পুত্রগণ এই ফিরাজ মিঞার কাছেই শরীর-চর্চার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এই মল্ল-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকার ফলে যতীন্দ্রনাথ অনেক কিছু শিক্ষা করার

সুযোগ পেয়েছিলেন যা উত্তরকালে তাঁর বিপ্লবী জীবনে অনেক সহায়ক হয়েছিল। এই পেশোয়ারি মল্লবীরের কাছ থেকে শুধু শরীর গঠনের শিক্ষা-ই তিনি লাভ করেন নি, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে যে স্বাধীনতা-প্রিয়তা ছিল, কিশোর যতীন্দ্রনাথের মধ্যে তাও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

বীরত্বের গরিমায় উজ্জ্বল যে জীবনে সর্বদা রণিত হতো জীবনের জয়গান, সেই বিপ্লবীর অন্তর কি রকম কোমল ছিল, কিরকম সহৃদয়-সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন তিনি তার পরিচয় আছে তাঁর ছাত্রজীবনের দু'টি ঘটনার মধ্যে। এই ঘটনা দু'টিই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনীকার শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। আমরা এখানে তাঁর বর্ণনার সারাংশ উদ্ধৃত করে দিলাম। এই ঘটনা দু'টিই তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর দিদিমায়ের কাছ থেকে, সুতরাং এই দু'টি ঘটনা প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে যে মানুষ বড় বয়, মহৎ হয়, সুন্দর হয়, তার আভাষ তার প্রথম জীবনের ছোট-খাট ঘটনার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালী সন্তানের জীবনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে এই জাতীয় বহু ঘটনা আছে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি সামান্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু তাঁদের উত্তরজীবনের অসামান্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে এইসব ছোটখাটো ঘটনা।

প্রথম ঘটনাটি এই।

"একদিন কুষ্টিয়া থেকে বাড়ি আসবার জন্য যতি কুষ্টিয়ার ঘাটে নৌকাতে চড়েছে, গ্রামের আরো কয়েকজন লোক সেই নৌকাতে ছিল, নৌকা তখনো ছাড়েনি—একটি পরিচিত দুঃখী ভিখিরী এসে সকলের কাছেই ভিক্ষে চাইতে লাগল; দুটো-একটা পয়সা অনেকের কাছেই সে পেল। যতির পরনে ছিল সেদিন সদ্য-কাচা কোট-প্যান্টের স্যুট। ভিখিরীটি এসে যতির কাছে ভিক্ষে চাইলে: দাদাবাবু,

আমাকে তোমার একটা পুরনো কাপড় দেবে? দেখ, আমার কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, গেরো দিয়ে আর পরা যায় না। যতি তার দিকে চেয়ে, তার শতছিন্ন বস্ত্রখানি দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। পকেটে হাত দিয়ে যা ছিল, সব বের করে দেখল—একটা দশটাকার নোট আর কিছু রেজগি পয়সা আছে। যতি আবেগের সঙ্গে তার হাত দুটো ধরে সেই হাতে নোট আর পয়সা সব গুঁজে দিয়ে বলল, না না গোবিন্দ, পুরোনো নয়, পুরোনো নয়, তুই এই দিয়ে ভাল নতুন কাপড় কিনে নিস।"

উত্তরকালে যিনি তাঁর বিপ্লবী-জীবনে সহচর ও সহকর্মিদের প্রতি অসীম ভালবাসা দেখাবেন, তাদের দুঃখ-কষ্টে বিচলিত বোধ করবেন ও তার প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, তাঁর স্বভাবের মধ্যে যে এইরকম মমতা-মাখানো শুচি-শুভ্র ভাবটি থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। বালেশ্বরের সেই সঙ্কটময় দিনটির কথা যখন স্মরণ করি তখন দেখতে পাই যে, অসুস্থ সহকর্মী চিত্তপ্রিয়কে পরিত্যাগ করে তিনি কিছুতেই তাঁর নিজের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন নি—এই মহত্ত্বের আভাস কি আমরা কুষ্টিয়ায় এই ঘটনাটির মধ্যে উপলব্ধি করি না?

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই।

দৈহিক বলের সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মনের উদারতাও ছিল অসাধারণ। সেই তরুণ বয়সেই তাঁর অন্তরে দয়া, সহানুভূতি ও মমতার যেন শেষ ছিল না। একদিন তিনি কুষ্টিয়া থেকে খেয়া পার হয়ে বাড়ি ফিরছেন। নদীর ঘাটে দেখলেন, এক মুসলমান বৃদ্ধা ঘাসের একটা বিরাট বোঝা নিয়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করছে। কত লোককে কাতর মিনতি করছে, তার মাথায় সেই বোঝা চাপিয়ে দিতে। কিন্তু বৃদ্ধার সেই কাতর মিনতিতে কেউই কান দিচ্ছে না। যতীন্দ্রনাথ তখন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বুড়িমা?

বৃদ্ধার সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল সেই মমতা-মাখানো কথায়। খোদা স্বয়ং যেন এই তরুণের বেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, মনে হলো তার। তখন সে সজল নেত্রে তার দুঃখের জীবনের কথা যতীন্দ্রনাথকে বলতে শুরু করে দিল। অতি দুঃখে তার দিন অতিবাহিত হয়। তার ঘরে একটি গরু আছে; তার জন্যে বহুকষ্টে এই ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বোঝাটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। বুড়ী তাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কত লোককে সে কাকুতি-মিনতি করেছে বোঝাটা তার মাথায় তুলে দেবার জন্যে, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় নি।

—বুড়িমা, তোমাদের বাড়ি কতদূরে? জিজ্ঞাসা করেন যতীন্দ্রনাথ।

—এই হেথা হতে আধকোসের পথ।

—কিন্তু তোমার বোঝাটা যে দেখছি খুব ভারি, এ তুমি বইতে পারবে?

—তা পারব। রোজই তো নিয়ে যাই। তবে আজ ঘাস কিছু বেশি কেটে ফেলেছি।

যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন, বোঝাটা রীতিমত ভারি। সেই ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে বুড়িকে যদি এক মাইল পথ যেতে হয় তাহলে অনেক কষ্ট পেতে হবে তাকে। যতীন্দ্রনাথ তখন কি করলেন? বোঝাটি বুড়ির মাথায় না চাপিয়ে দিয়ে, নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি পর্যন্ত চললেন। কাদায়-মাখা ভিজে ঘাস; যতীনের পরনে ছিল ঝকঝকে কোট-প্যাণ্ট। কাদায় কাদা হয়ে গেল সব, কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। বোঝাটা তো পৌঁছে দিলেনই, আবার আসবার সময় বৃদ্ধার হাতে গোটাকতক টাকাও দিয়ে এলেন। এতখানি কোমল ছিল তাঁর হৃদয়।

শ্রীঅরবিন্দ যে বলেছিলেন, যতীন আশ্চর্য মানুষ, তা মিথ্যা নয়। সেই আশ্চর্য-চরিত্রের মানুষটির হৃদয়ের একদিক ছিল যেমন কোমলতায় পূর্ণ, অন্যদিক ছিল তেমনি কঠোর নির্ভীক—যেন একখানি

গ্রানিট পাথর। যেমন ছিল তাঁর দেহে শক্তি তেমনি ছিল তাঁর মনে সাহস আর তেজ। স্কুল ও কলেজের বহু সহপাঠী তাঁর এই শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল। সহপাঠীদের কারো মধ্যে আচার-আচরণের নৈতিক শিথিলতা দেখলে, বা দুর্বলতা দেখলে তিনি তাদের ধমক দিতেন; বলতেন, মরদের বাচ্চা হবি। স্বামীজির লেখা পড়িসনি—দুর্বলতার চেয়ে বড় পাপ নেই; চরিত্রের চেয়ে বড় শক্তি নেই!

মামাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যতীন খুব লেখাপড়া শেখেন, অন্তত বি. এ. পাশ করেন। কিন্তু তাদের এই ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর পৈতৃক অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। এতকাল তিনি মামাদের কাছে মানুষ হয়েছেন, মা তাই বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, যতীন্দ্রনাথ যেন একটি চাকরির চেষ্টা করেন। ইংরেজিটা তাঁর খুব ভাল জানা ছিল। তখনকার দিনে এনট্রান্স পাশ-করা ছেলেদের ভাল চাকরি হওয়া একেবারেই কঠিন ছিল না। তার উপর তাঁর মামারা ছিলেন বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন—সরকারি মহলে তাঁদের প্রতিপত্তিও কম ছিল না। তাই শরৎশশী দেবী একদিন কথাটা তুললেন তার অগ্রজ বসন্তকুমারের কাছে।

—যতি তো এখন সাবালক হয়েছে, দাদা। এইবার তাকে একটা কাজকর্মে ঢুকিয়ে দাও। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে, এইবার যতির একটা আমি বিয়ে দেব।

—কিন্তু কলেজের পড়াটা শেষ হোক, তারপর এ বিষয়ে চিন্তা করা যাবে।

—না দাদা, এতটা কাল তোমাদের আশ্রয়ে থেকে মানুষ হলো, এইবার একটু নিজের পায়ে ও দাঁড়াতে শিখুক আর আমিও স্বামীর ভিটেয় ফিরে যাই।

সহোদরার নির্বন্ধাতিশয্যে বসন্তকুমার অতঃপর সেই চেষ্টাই করলেন। ছেলেকেও শরৎশশী দেবী একদিন ঐ কথা বললেন—

যতি, আর তোকে পড়তে হবে না। এইবার তুই একটা কাজের চেষ্টা কর। এই পরাশ্রিত জীবন আর ভাল লাগে না। তোর মুখ চেয়েই আমি এতদিন এখানে পড়ে আছি। মায়ের মনের ব্যথা পুত্র যেন হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন, যদিও তাঁর মাতুলদের অপরিসীম স্নেহের মধ্যে তিনি এতটুকু কৃত্রিমতা খুঁজে পাননি কোন দিন। বসন্তকুমার তো তাঁর ভাগিনেয়কে পুত্রতুল্য জ্ঞান করতেন। অন্ততঃ বি. এ. পর্যন্ত পড়বার ইচ্ছাটা যতীন্দ্রনাথের মনে প্রবল ছিল। কিন্তু মায়ের দাবীর কাছে তাঁর মনের সেই ইচ্ছা মনের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেল।

অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন তিনি। বিধবা মায়ের জীবন সুখে-শান্তিতে ভরিয়ে তুলবার জন্য তিনি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর কথা আর এতটুকু চিন্তা করবার অবসর পেলেন না। কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি অর্থোপার্জনে এইবার সচেষ্টা হলেন। শিখতে লাগলেন শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং। মাত্র তিন মাসের চেষ্টাতেই তিনি এই দু'টি বিদ্যা এমন দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন সুদক্ষ স্টেনোগ্রাফার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তখনকার দিনে ভাল স্টেনো-টাইপিস্টের খুব আদর ছিল। অতঃপর তিনি চাকরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। নিজের যোগ্যতার উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস; তাই কারো কাছ থেকে কোন সুপারিশ না নিয়েই তিনি কলিকাতার অফিসে-অফিসে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন।

একদিন।

তখন শোভাবাজারে তাঁর মেজমামার বাসায় থাকেন যতীন্দ্রনাথ। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং পাশকরা হয়ে গেছে; দু'একটা অফিসে চাকরির দরখাস্তও করেছেন। কাজের অভিজ্ঞতা নেই বলে তার একটারও জবাব আসেনি অথবা তেমন কোন জোরদার সুপারিশ ছিল না বলেও হতে পারে। কিন্তু নিরুদ্যম হওয়ার ছেলে তিনি ছিলেন

না। মাকে সুখী করতে হবে, মায়ের দুঃখ মোচন করতে হবে, মায়ের বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে, এই চিন্তা তখন যুবক যতীন্দ্রনাথকে এমন ভাবেই অস্থির করে তুলেছিল যে, একটা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন সুস্থির বোধ করছিলেন না।

সেদিন ডালহৌসি স্কোয়ারে একটা সওদাগরী অফিসে তিনি ঢুকে পড়লেন। যতীন্দ্রনাথ দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, স্যুট পরলে তাঁকে অতি সুন্দর দেখাতো। অফিসের বড়বাবুর কাছে গিয়ে তিনি বললেন যে, তিনি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। বড়বাবুটি বোধ হয় আগন্তুকের ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক আকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইণ্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করে দিলেন। বড়সাহেবের খাস-কামরা থেকে এলো কলিং-বেলের আওয়াজ। অমনি ছুটলেন বড়বাবু। ফিরে এসে হাসি মুখে বললেন, ইয়ং ম্যান তোমার বরাত ভাল, সাহেব তোমাকে এক্ষুণি ডেকেছেন। বড়-বাবুটি বেশ বয়স্ক লোক, তাই যতীন্দ্রনাথকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেও এজন্য তিনি আপত্তি করলেন না, বা অসন্তুষ্ট হলেন না এতটুকু। বাঙালী সমাজ-জীবনের এ ধরনের রীতিনীতির সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন।

এই সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবটি ছিলেন একজন খাঁটি ইংরেজ। তিনি চাকুরীপ্রার্থী যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দু'-একটি বাক্য-বিনিময় করে তার প্রতি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হলেন। সেইদিনই সেই অফিসে কাজে বহাল হলেন তিনি একশো টাকা মাহিনাতে। যতীন্দ্রনাথের আশা ছিল আরো বেশি। কিন্তু সৌভাগ্যের শিখরে উঠতে হয় ধাপে ধাপে। এটা ছিল তাঁর প্রথম ধাপ। এই অফিসে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি মজঃফরপুরে বেশি মাইনের আর একটা চাকরি পেয়ে সেখানে চলে গেলেন। এই চাকরিটার সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর ছোটমামার এক বন্ধু; তিনি মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন। এখানে তিনি কেনেডি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হলেন। এখানে

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, যতীন্দ্রনাথ যখন চাকরির অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন, সেইসময়ে তাঁর জীবনে এলো নিয়তির আর একটি নিষ্করুণ আঘাত। ১৮৯৯ সনের শেষভাগে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন, আর আজ উনিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারালেন। সংসারে বন্ধন বলতে আর কিছু রইল না তাঁর। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে ; মা নেই, বাবা নেই, তবে আর কার জন্য সংসারে মায়া ?

এই প্রশ্ন যখন তাঁর মনে তীব্র হয়ে উঠল, তখন সাময়িক একটা বৈরাগ্যের ভাব দেখা গেল যতীন্দ্রনাথের মধ্যে। সেই বৈরাগ্য তাঁকে টেনে নিয়ে এল একদিন হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরি মহারাজের পদপ্রান্তে।

যতীন্দ্রনাথ ভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রথম যৌবনেই তিনি ভারতের এই অন্যতম ধর্মগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিপ্লবী নায়কের জীবনে এই ঘটনাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। তাঁর কোন জীবন-চরিতকারই কিন্তু এই ঘটনাটির উপর তেমন গুরুত্ব দেন নি। বিপ্লবীর জীবনে ধর্মবোধ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস হয়ত আজকাল অনেকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন না, কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদের আদি পর্বের ইতিহাস ও সেই ইতিহাসে যাঁরা প্রথম যুগের বিপ্লবী বলে খ্যাত ও পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের জীবনানুশীলন করলে আমরা কি দেখতে পাই?

দেখতে পাই যে, ধর্ম ও জাতীয়তা এই দুইটিই যেন বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের জীবনবীণার তারে ঝঙ্কার তুলত এবং এই দুইটি ভাবই তাঁদের জীবনে সমান মর্যাদা পেয়েছে। মানুষ তখনি জীবন ও মৃত্যুকে সমানভাবে তুচ্ছজ্ঞান করতে সক্ষম হয় যখন তার অন্তরে ভগদ্ভক্তি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস একটি বিশেষ চেতনার মুদ্রা অঙ্কিত করে দেয়। চৌদ্দ-পনর বছর ধরে বিলেতে থেকে লেখাপড়া শিখে ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়েও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে যে ধর্মভাব বা ঈশ্বর-বিশ্বাস অটুট ছিল, এটা বাঙালীর সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। বিপ্লবের এই রণগুরুর বিরাট জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি যে জাতীয়তাবাদ প্রচারে অক্লান্ত ভাবে তাঁর লেখনীকে পরিচালনা করেছিলেন, তার বনিয়াদ ছিল ধর্ম। এই ধর্মবোধটা ছিল তাঁর সহজাত। কার্যক্ষেত্রে একেই তিনি একটা নূতন ব্যঞ্জনা দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর মধ্যে কোমলতা ও কঠোরতার যে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই, তা কি আদৌ সম্ভব হতো যদি তাঁর মধ্যে ধর্মভাব বা ঈশ্বর-বিশ্বাস-এর ভাব বিদ্যমান না থাকত? এই আশ্চর্য মানুষটির অস্থি ও মজ্জায়, এবং শোণিত-প্রবাহের মধ্যে যে ভাবটি সবচেয়ে প্রবল ছিল তা একান্ত ভাবেই ধর্মীয় ভাবের দ্বারা পরিশীলিত ছিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ভাবধারা তিনি আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলেই ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তাঁর দেশপ্রেমের নভোস্পর্শী সৌধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তারপর যৌবনকালেই এক বিশেষ ঘটনাচক্রে যখন তিনি ভোলানন্দ গিরির মতো একজন ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের কৃপা লাভ করেন, তখন থেকে তাঁর জীবনধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে খাতে বইতে আরম্ভ করে, তার সবটাই তো ধর্মীয় ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এই তরুণের অন্তরপটে যেদিন এই সন্ন্যাসী শিবমন্ত্রের মহিমাময় মুদ্রা অঙ্কিত করে দেন সেইদিন সেই সঙ্গে তিনি শিষ্যের শরীর ও মন দুই-ই যেন অক্ষয় কবচ দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে গিরিমহারাজের আশ্রম।

যেন প্রাচীন ভারতের একটি শান্ত তপঃশুদ্ধ তপোবন।

সেই আশ্রমে একদিন শান্তির আশায় এসে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ। সদ্য মাতৃবিয়োগ-জনিত ক্ষত তাঁর হৃদয়ে তখনো তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে চলেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। জীবনটাই যেন অর্থহীন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ভোলাগিরির নাম তিনি শুনেছিলেন তাঁর মেজমামার কাছে এবং কলিকাতা শহরের ভবানীপুর অঞ্চলে বহু বিশিষ্ট বাঙালী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, এসব কথা তিনি তখন জানতেন এবং তাঁর মেজমামার সঙ্গে একদিন ভবানীপুরের অচল মিত্রের বাড়িতে গিয়ে গিরিমহারাজের ছবিও তিনি দেখেছিলেন। দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে যখন তাঁর কাছে পৃথিবী শূন্য বলে মনে হলো,

তখন তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল এই সমদর্শী সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্তি।

শিবকল্প মহাযোগী ভোলানন্দ গিরি।

অপরিমেয় তাঁর যোগশক্তি।

অসীম তাঁর তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

ভারতের সাধুসমাজে অসামান্য তাঁর প্রতিষ্ঠা।

লালতারাবাগে ভোলাগিরির আশ্রম সেদিন একটি তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হতো। সেই মহাতীর্থে অশান্ত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াবার আশায় ছুটে এসেছেন আজ যতীন্দ্রনাথ। কাউকে না জানিয়েই এসেছেন। আমাকে দীক্ষা দেবেন ?—এই ছিল তাঁর প্রথম প্রশ্ন। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন গিরি মহারাজ দেখলেন অবনত শিরে তাঁর চরণতল যে তরুণ স্পর্শ করেছে, সে সাধারণ লোক নয়। একটি প্রদীপ্ত হোম-হুতাশনের শিখা যেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। যুবকের চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এক অসাধারণত্বের চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত।

—বেটা, বৈঠ যাও। সব কুছ মিল যায়েগা।

যতীন্দ্রনাথের অন্তর যেন শীতচন্দনের প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে গেল সেই সুমিষ্ট কথা কয়টি শুনে। সুগৌর কান্তি, সৌম্যদর্শন এই মহা-যোগীকে তিনি সন্দর্শন করলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো। ভারতের সাধুসমাজ যাঁকে মণ্ডলীশ্বর রূপে সম্মানিত করেছেন সেই সাধকশ্রেষ্ঠের এই সস্নেহ কথা কয়টি শুনে যতীন্দ্রনাথ যারপরনাই শান্তি বোধ করলেন। আত্মপর ভেদজ্ঞান-রহিত এই মহাপুরুষের কাছে যতীন্দ্রনাথ পরের দিন সকালবেলায় দীক্ষা লাভ করে ধন্য হন।

—বেটা, আভি ঘর চলা যা, কাম করো; সাদী করো। লেকিন দিল সাঁচ্চা রাখ না ঔর ধ্যান ভি কর না। সব ঠিক হো যায়েগা। তোম সে দুনিয়ামে বহুৎ কাম হোগা।

গিরি মহারাজের করুণা লাভ করে সপ্তাহকাল পরে যতীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় ফিরলেন তখন শোভাবাজার ও কৃষ্ণনগর তাঁর চিন্তায়

অস্থির হয়ে পড়েছে। যেমন আকস্মিক ছিল তাঁর অন্তর্ধান, তেমন আকস্মিক ছিল এই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু সে মানুষ কই? সবাই সবিস্ময়ে দেখে এক নূতন যতীন্দ্রনাথ। দিদি বিনোদবালা এসে ভাইকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেন, যতি, সত্যি তুই আমাদের সবাইকে বড় ভাবিয়ে তুলেছিলি। কোথায় গিয়েছিলি বলত, আর কেনই বা গিয়েছিলি?

তখন যতীন্দ্রনাথ তাঁর হরিদ্বার যাওয়ার কাহিনী ও সেখানে গিরিমহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণের কথা বাড়ির সকলকে বললেন। সহোদরাকে বললেন, দিদি, বাবা মারা যাওয়ার পর মামাদের আশ্রয়ে থেকে মানুষ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করে জীবনে আমি অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে ধন্য হয়েছি, তাঁদের আদর্শে জীবন গঠনের সুযোগ পেয়েছি—এটা আমার কম ভাগ্যের কথা নয়, কারণ আমার মামাদের মতো মামা ক'জন ছেলের ভাগ্যে ঘটে তা আমি জানি না আর এজন্য আমি ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই। তেমনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে যেদিন মা-কে হারালাম, সেদিন আমি এই পৃথিবী শূন্য দেখেছিলাম, সংসারের রঙ আমার কাছে যেন ফিঁকে হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমার মা শুধু মা ছিলেন না, একাধারে তিনিই আমার মা ও বাবা ছিলেন। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য আমাকে আজ এনে দিয়েছে চরম সৌভাগ্য, কারণ এখন আমি যাঁর কৃপালাভ করেছি তিনি একজন জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি আমার জীবনের শূন্যস্থান এখন পূর্ণ করেছেন আর এমন ভাবে অ করেছেন যা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি, দিদি।

বিনোদবালা সবিস্ময়ে শুনলেন তাঁর অনুজের কথাগুলি।

যতীন তাঁর বড় আদরের ভাই। যতীন ছিল তাঁর মায়ের চোখের মণি, নিঃসম্বল জীবনের পরম নিধি। সেই মা আজ লোকান্তরে চলে গেলেন। যতীনকে তিনি সংসারী করবেন, এই ছিল তাঁর

বড় আশা। তাই বিনোদবালা তাঁর আদরের ভাইটিকে বললেন, দীক্ষা নিয়েছ খুব ভাল করেছ। এইবার মন দিয়ে কাজকর্ম কর, বিয়ে-থা কর, তাহলে মায়ের আত্মা শান্তি পাবে।

—যদি গুরু মহারাজের আদেশ হয়, নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখব দিদি। আমার জীবনের নিয়ন্ত্রক এখন তিনি।

বিনোদবালা তাকিয়ে দেখেন সহোদরের মুখের দিকে—সে মুখের ছবি যেন আলাদা। ধর্মের বিভায় সে আনন উদ্ভাসিত, ঈশ্বর-বিশ্বাসে উজ্জ্বল সেই ললাট। যতীনের এই মানসিক রূপান্তরটা আমরা যদি উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে সেই বিপ্লবী-নায়কের জীবনের অন্তঃপুরে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারব না। তিনি ভাব-বিলাসী মানুষ ছিলেন না, আবেগ বা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তাঁর স্বভাব থেকে শতহস্ত দূরে থাকত। শৈশব থেকে মাতৃবিয়োগের কাল পর্যন্ত নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর মহিমান্বিত জীবন—সে জীবনে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংকীর্ণতা বা দৈন্য বলতে কিছু ছিল না। ইস্পাতকঠিন একটি বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল একটি আশ্চর্য, সুন্দর ও শুচিশুভ্র মন। সেই দেহ আর মন আজ যেন এক নূতন বিশুদ্ধতার মধ্যে উত্তীর্ণ হলো ভোলানন্দ গিরিমহারাজের পুণ্যস্পর্শে। এক নূতন শক্তি, আর নূতন তেজ যেন এই তরুণের সমগ্র সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। ভবিষ্যতে বিপ্লবযজ্ঞে যিনি পূর্ণাহুতি প্রদান করবেন হাসিমুখে বীরের মতো এবং যিনি নেতৃত্বের একটি নূতন আদর্শ রেখে যাবেন তাঁর দেশবাসীর কাছে, সেই সর্বকালের আদর্শ বিপ্লবীবীরের জীবনে—তাঁর দেহে ও মনে এই রূপান্তর সাধনা বুঝি নিয়তিনির্দিষ্ট ছিল। বাংলাদেশে তাই একটি ভিন্ন দু'টি বাঘা যতীনের জন্ম হয়নি। এমন অসাধারণ দৈহিক বল আর অতিমানবিক মনের বলের প্রকাশ বাঙালী তাই আর কারো মধ্যে দেখে নি।

হরিদ্বার থেকে ফিরে আসার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রনাথ একটি ভাল সরকারি চাকরি পেয়ে গেলেন। তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফারের পদে নিযুক্ত হলেন। এই সরকারি চাকরি এই বিপ্লবীর জীবনে খুব সহায়ক হয়েছিল, কারণ এই চাকরির সুযোগেই তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বহু বৈপ্লবিক কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পেয়েছিলেন। চীফ সেক্রেটারীর স্টেনোগ্রাফার, তাঁকে সন্দেহ করবে কে? এই দৃষ্টান্তের তুলনা আছে আরেকজন বিপ্লবীবীরের জীবনে—তিনি স্বনামধন্য রাসবিহারী বসু। দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ অফিসে তিনি চাকরি করতেন এবং সেই সুযোগে তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত কেমন করে বৈপ্লবিক সংগঠন কার্যের নেতৃত্ব করেছিলেন তা লেখকের 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসু' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

এই চাকরি হওয়ার অল্পকাল পরেই দিদির একান্ত অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ বিয়ে করেন ১৯০০ সনে। তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর। স্ত্রী ইন্দুবালা সর্বাংশে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। যতীন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র, সে বছর (এপ্রিল, ১৮৯৮) কলকাতায় ভীষণ প্লেগ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা তখন থাকতেন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটি বাড়িতে। স্বামিজী তখন দার্জিলিঙে বিশ্রামের জন্য গিয়েছেন। প্লেগের সংবাদ পেয়ে তিনি কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে রোগী শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন। বেলুড় মঠে তখন রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীবৃন্দ পীড়িতের সেবাকার্যে নামবার আয়োজন করলেন।

শহরে প্লেগনিবারণের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন নিবেদিতা; সে সময় অনেকেই তাঁকে বাগবাজারের রাস্তায় ঝাড়ু ও কোদাল হাতে রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখেছিলেন। এই রিলিফের

কাজে কলিকাতার কলেজের ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে সেন্ট্রাল কলেজের অন্যতম ছাত্র যতীন্দ্রনাথও ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই বিদুষী আইরিশ তরুণী ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৯৮ সনের জানুয়ারি মাসে; বিবেকানন্দ তার কিছু আগে পাশ্চাত্যদেশে অদ্বৈতবেদান্তের বাণী প্রচার করে বিজয়ীর গৌরব নিয়ে দেশে ফিরেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে দেখা করার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগেছিল যতীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে। শহরে প্লেগের সংকটত্রাণ কার্যে যতীনের আন্তরিকতা দেখে নিবেদিতা এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনিই স্বামীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

স্থান—বেলুড় মঠ।

সময়—১৮৯৮, মে মাসের একদিন। অপরাহ্ন।

উপরে তাঁর ঘরটিতে বসে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। গুরুভাই ও শিষ্যদের সঙ্গে প্লেগের রিলিফ কাজ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন তিনি। এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন, সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ। নিবেদিতা গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, একটি ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছি, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। আপনার দর্শনলাভের জন্য ছেলেটি খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আমার কাছে। আমাদের রিলিফের কাজে এ খুব সাহায্য করেছে। কলেজে পড়ে। এই বলে তিনি চুপ করলেন।

স্বামীজিকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন যতীন্দ্রনাথ।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলেন তরুণের মাথায় হাত দিয়ে। তারপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে মহাপুরুষ একবার তাকালেন তাঁর দিকে। আয়ত চক্ষু দুটির প্রশান্ত দৃষ্টি যতীনের হৃদয়ে এক নূতন ভাবের সঞ্চার করল। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের কথা তিনি তাঁর স্কুল-জীবন থেকে শুনে আসছেন; আজ তাঁর এত কাছাকাছি বসতে

পেয়ে তিনি যেন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন। কী অসাধারণ পুরুষ! গোটা ভারতবর্ষকে তিনি নিজের কাঁধে করে ঘুরে বেরিয়েছেন সারা পৃথিবী, অথচ শিশুর মতো কি সরল ও সহজ!

—কী নাম তোমার? মধুর কণ্ঠের সানুরাগ জিজ্ঞাসা।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—কোন্ কলেজে পড়?

—সেণ্ট্রাল কলেজে, ফার্স্ট আর্টস ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।

—দেশ কোথায়? বাড়িতে কে কে আছেন? এখানে কোথায় থাক? এমন করে খুঁটিয়ে পরিচয় নিলেন তিনি যে যতীনের সমস্ত দেহ-মন যেন অঞ্জলি হয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হতে চাইলো। স্বামীজি অনুভব করলেন, যে তরুণ তাঁর সামনে বসে আছে ভস্মের আবরণে সে যেন একটি অগ্নিশিখা। তার আকৃতি, তার ললাট, তার চক্ষু দেখে, তার কথাবার্তা শুনে তিনি যারপরনাই প্রীত হলেন। তারপর যখন জানতে পারলেন যে সেই বয়সেই এই তরুণ দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে, তখন তিনি তাঁকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন, তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হোক, তুমি জয়ী হও।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যতীন্দ্রনাথ—দুই শতাব্দীর দুইটি অগ্নিশিখা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে একটি শিখা তখন নির্বাপিত হওয়ার পথে, আর বিংশ শতাব্দীর সূচনায় অপরটি উদ্ভাসনের অপেক্ষায়। একজন বাঙালী লেখক যথার্থই মন্তব্য করেছেন; "বিবেকানন্দ ও বাঘা যতীন যেন দুইটি বিভিন্ন দেহে একটি মাত্র ব্যক্তি। দুইজন দুই যুগের মানুষ। বিবেকানন্দ যদি যতীন্দ্রনাথ হইতে ইচ্ছা করিতেন আর যতীন্দ্রনাথ যদি বিবেকানন্দ হইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই তাঁহাদের ভূমিকার বিনিময় করিতে পারিতেন।" এই মন্তব্যটি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য এবং যতীন্দ্র-মানসের নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করার পক্ষে ইহা সহায়ক। আমরা কল্পনা করতে পারি,

স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর এই তরুণের মনে সেদিন এই ধারণাই বদ্ধমুল হয়েছিল যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সুদূরপরাহত।

এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলার আছে। পরবর্তীকালে কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—ভারতের পক্ষে কোন্‌টি আগে প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক উন্নতি, না রাজনৈতিক স্বাধীনতা? এর উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বাঘা যতীনকে যা বলেছিলেন তা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কথারই পুনরুক্তি। কিন্তু তিনি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হবে শুধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে নয়, সশস্ত্র বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেদিন বাঘা যতীন, আমরা অনুমান করতে পারি, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে তাঁর নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ—এই দু'জনেই ছিলেন তাঁর বিপ্লবী-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। কারণ, এই দু'জনই ছিলেন বাহুবলে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী। বাঘা যতীন তাই সর্বতোভাবেই বিবেকানন্দ—অরবিন্দের ভাবধারার উত্তরসাধক।

তাঁর যৌবনকালে শক্তির স্ফটিক-মূর্তি ছিলেন বাঘা যতীন।

তাঁর অস্তিত্বকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত একটা প্রবল ও দুর্বার শক্তির তরঙ্গায়িত চাঞ্চল্য।

নানা ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেত এই উদ্দাম শক্তি।

শক্তি ও শক্তির আনন্দ দুই-ই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকত তাঁর সত্তার সঙ্গে এবং মাঝে মাঝে তার বিস্ফোরণ দেখে সবাই চমকিত হতো। স্ফুলিঙ্গবর্ষী সেই শক্তি তাঁর চরিত্রকে দিয়েছিল একটি বিশিষ্টতা। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে যেসব বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে এই শক্তি লীলায়িত হয়ে উঠত, পরবর্তীকালে তাই-ই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। এই অতিমানবিক দৈহিক ক্ষমতা তাঁর চরিত্রকে একদিকে দিয়েছিল একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা, অন্যদিকে তাঁকে করে তুলেছিল তরুণদের কাছে অতিমাত্রায় আকর্ষণীয় এবং শ্রদ্ধেয়। সরকারি চাকরি উপলক্ষে বছরের মধ্যে ছয়মাস তিনি থাকতেন কলিকাতায় আর বাকী ছয়মাস দার্জিলিঙে। কিন্তু যখন যেখানেই থাকতেন যতীন্দ্রনাথ, তরুণের দল তাঁকে দেখে আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'পার্সনাল ম্যাগনেটিজম্' তাঁর চরিত্রে তার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল, এই কথা লেখক শুনেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে যাঁরা বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

শৌর্য, বীর্য, সাহস, ত্যাগ,

প্রেম, করুণা ও দেশপ্রীতি—

এই সব বিবিধ গুণের বিগ্রহমূর্তি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

তাঁর যৌবনকালের শক্তিমত্তার কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এক জীবনীকার। এই সব ঘটনার মধ্যে দু'টি ঘটনা

পরবর্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেই ঘটনা দুইটির উল্লেখ করব।

একবার সরকারি কাজে দার্জিলিঙ চলেছেন যতীন্দ্রনাথ। পথে শিলিগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। তিনি যে কামরায় ছিলেন সেই কামরায় ছিলেন একটি অসুস্থ বাঙালী মহিলা। তাঁর প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে; স্বামী স্টেশনের পানি-পাঁড়েকে ডেকে জল সংগ্রহের চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোথায় পানি-পাঁড়ে, আর কোথায় বা জল। অথচ কামরা থেকে নেমে যে কল থেকে জল আনবেন, তাও পারলেন না; কারণ প্লাটফর্মের যে অংশে তাঁদের কামরা সেখান থেকে জলের কল অনেক দূরে, প্রায় প্লাটফর্মের এক প্রান্তে বললেই হয়। এই দেখে পরদুঃখকাতর যতীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভদ্রলোকের হাত থেকে জলের ঘটিটা নিয়ে প্লাটফর্মে নেমে বিদ্যুৎবেগে ছুটলেন জল আনতে।

নানা লোকের ভীড় প্লাটফর্মে। সেই ভীড়ের মধ্যে একস্থানে পাঁচটি লালমুখ মিলিটারি সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পথে-ঘাটে এইসব গোরাসৈন্যদের অত্যাচারের নানাবিধ কাহিনী প্রায়ই শোনা যেত, কাগজে মাঝে মাঝে তার বিবরণও বেরুত। এই সব উদ্ধত সৈন্য এদেশীয় লোকদের মানুষ বলেই মনে করত না। ড্যাম, সোয়াইন্, নিগার এই ছিল তাদের মুখের অতি পরিচিত সম্ভাষণ। পরাধীন জাতি মুখ বুজে এসব সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল, রুখে দাঁড়াবার সাহস যেন তাদের ছিল না অথবা প্রতিকারের কথাও যেন তারা চিন্তা করত না। বাঙলা দেশে যতীন্দ্রনাথ থেকেই এর প্রথম ব্যতিক্রম শুরু হয়।

"যতীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছেন জল আনতে, অন্যদিকে হুঁশ নেই। ছুটে যেতে একজন সাহেবের গায়ে একটু ধাক্কা লেগে গেল। যতীন্দ্রনাথ থেমে বললেন: আই য়্যাম সরি। কিন্তু সাহেবটি এই সৌজন্যের প্রতি গ্রাহ্য না করে তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে

যতীন্দ্রনাথের পিঠের উপরে শপাং করে বাড়ি বসিয়ে দিলেন। পলকের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু তিনি কিছু না বলে সাহেবদের দিকে একবার মাত্র চেয়েই ছুটলেন জলের কলের দিকে। কল থেকে জল নিয়ে কামরাতে এসে ভদ্রমহিলার স্বামীর হাতে ঘটিটা দিয়ে, আবার চললেন সেই মিলিটারি সাহেবদের দিকে। সাহেবদের সামনে এসেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন ঃ নাউ রিমেমবর ইওর গড (এইবার তোমাদের ভগবানকে স্মরণ কর)—এই বলেই মারলেন তার নাকে এক ঘুষি, যে তাঁকে মেরেছিল।"

ঘুষি খেয়ে শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবটি তো প্লাটফর্মের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তখন বাকী সৈন্য চারজন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং চারজনেই এক সঙ্গে যতীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করল। এ যেন চক্রব্যূহের মধ্যে সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে আক্রমণ। প্লাটফর্ম শুদ্ধ লোক এসে জড়ো হয় সেখানে। মেলট্রেনের গার্ড, স্টেশন-মাস্টার পর্যন্ত সেখানে ছুটে এলেন। যতীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সেই চারজন গোরা-সৈন্যকে একাই ধরাশায়ী করলেন। সবাই সবিস্ময়ে দেখল, বাঙালী মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিতেও জানে। এই মারামারিতে যতীন্দ্রনাথ অবশ্য যথেষ্ট আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একাকী সেদিন নিরস্ত্র অবস্থায় যেভাবে বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছিলেন তা সমকালীন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই শতকের সূচনায় যতীন্দ্রনাথ প্রমাণ রাখলেন যে বাঙালী কাপুরুষ নয়। সমকালীন সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, শিলিগুড়ি স্টেশনের এই ঘটনাটি মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে সারা বাংলাদেশেই সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই অখ্যাত তরুণ 'দি হিরো অব্ শিলিগুড়ি'—এই নামে যুবক সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। এইটাই কি ভবিষ্যতের বালেশ্বর যুদ্ধের পূর্বাভাষ ছিল?

কথিত আছে যে, লাঞ্ছিত ও আহত গোরাসৈন্যরা যতীন্দ্রনাথের

বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল। যখন তাঁর কাছে আদালতের সমন এসে পৌঁছল, তখন তিনি হুইলার সাহেবকে ঐ সমনখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এখন কি করা যায়? হুইলার সাহেব তাঁর স্টেনো-গ্রাফারের এই বীরত্বের জন্য তাকে যথেষ্ট বাহবা দিয়েছিলেন এবং তাঁরই মধ্যস্থতায় এই মামলা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হয়েছিল। মামলা প্রত্যাহৃত হলো বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে ইংরেজের পুলিশের খাতায় 'এ ডেনজারাস ফেলো' হিসাবে তাঁর নামটা উঠে গেল ও লালবাজারের সর্তক দৃষ্টি সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করার অবকাশ কোথায়? তিনি যে চীফ সেক্রেটারির বিশ্বস্ত স্টেনো।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো রোমাঞ্চকর।

এটিও তাঁর অমানুষিক শক্তি ও সাহসের নিদর্শন হয়ে আছে।

তাঁর মামার বাড়ি কয়াগ্রামে একবার একটা বাঘের উৎপাত হয়। গ্রামশুদ্ধ লোক আতঙ্কিত হয়েছে, কখন কার গোয়াল থেকে গরুটা বা ছাগলটা বাঘের পেটে চলে যায়, সেই ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। অনেক চেষ্টা করেও গ্রামের লোকেরা বাঘটাকে বাগে আনতে পারে নি। দু'একটা বন্দুক যে গ্রামে ছিল না, তা নয়, এবং তা দিয়ে দু'একবার চেষ্টাও করা হয়েছিল; কিন্তু বাঘটা ছিল আসল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তাকে কাবু করা অত সহজ ছিল না। এমন সময় একদিন অনেক রাতে কলিকাতা থেকে কয়াতে এলেন যতীন্দ্রনাথ। পরের দিন খুব সকালে গ্রামবাসীদের মোড়ল-স্থানীয় জনকতক লোক এল তাঁর মামার বাড়িতে। চাটুয্যে বাড়িতে বন্দুক আছে তারা জানত আর এ বাড়ির বাবুরা বন্দুক ছুঁড়তেও জানেন।

—বাবু, বাঘের উপদ্রবে আমরা তো আর তিষ্ঠুতে পারি না।

—বলো কি মোড়ল; ক'টা গরু-ছাগল গেল বাঘের পেটে?

—তা বাবু আধ ডজন গেছে। আপনাদের দো-নলাটা নিয়ে একবার আসুন না কলুপাড়ায়।

—সেখানে কি?

—আমরা দেখে এলাম সেখানে বেতের বনের মধ্যে বাঘটা ঘুমুচ্ছে।

বাড়ির ছেলেরা ভাবল যতীনকে সঙ্গে নিলে ভাল হয়, কারণ তার চেয়ে পাকা শিকারি আর কে আছে? তিনি তখনো পর্যন্ত ঘুমুচ্ছেন। বসন্তকুমারের বড় ছেলে এবং হেমন্তকুমারের মেজ ছেলে এই দু'জন বন্দুক নিয়ে মোড়লদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বাড়িতে বলা রইল, ঘুম থেকে উঠলেই যতিদাকে যেন কলুপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের শিকার-পার্টি কেনেস্তারা বাজাতে বাজাতে চলেছে কলুপাড়ার বেতবনের দিকে। দিনের সূর্য তখন পূর্ব আকাশে অনেকখানি উপরে উঠেছে। ঘন বেতবনের মধ্যে সদ্য নিদ্রাভঙ্গের পর বিশালদেহ সেই বাঘটি সকালবেলার ঈষৎ তপ্ত রৌদ্র উপভোগ করছিল।

এদিকে ঘুম থেকে উঠে সব কথা শুনে যতীন্দ্রনাথ যে অবস্থায় ছিলেন,—অর্থাৎ পরণে লুঙ্গি ও গায়ে একটি শার্ট—সেই অবস্থায় তিনি ছুটলেন শিকার-পার্টির সঙ্গে যোগদান করতে। যাবার সময় সঙ্গে নিলেন কলমকাটা একটি ছোট্ট ছুরি। "ছুরিখানা শার্টের পকেটে মুড়ে রেখে দাঁতন করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ, যেতে যেতে তিনি দূর থেকে বহু মানুষের উন্মত্ত চীৎকার আর টিনের কেনেস্তারা পিটানোর শব্দ শুনতে পেলেন; তখন বুঝলেন যে জনতা বাঘ দেখতে পেয়েছে। তিনি তখন যেদিকে শব্দ হচ্ছে সেদিকে চললেন। একটুখানি অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলেন যে, এক বিশাল জনতা ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে, তাদের দলের পুরোভাগে তাঁর মামাত ভাই মণীন্দ্র বন্দুক নিয়ে ছুটে আসছে।

"হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ দেখেন, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার একবারে পাশ থেকেই বেরিয়ে পড়ল বাঘটা। যতীন্দ্রনাথ বন্দুক তুলে তক্ষুণি গুলি করলেন, কিন্তু গুলিটা বাঘের মাথার চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বাঘ অমনি তাঁর দিকেই ছুটে এল ও তাঁর কাঁধের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহত বাঘ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রথম চোটেই বাঘটা তাঁকে মাটির নীচে ফেলে দেয়। চকিতের মধ্যে তিনি উঠে দাঁড়াতেই বাঘ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার দুই থাবা তাঁর দুই কাঁধের উপরে ন্যস্ত করে তাঁর গলা কামড়াবার জন্য তার দংষ্ট্রা বার করল। যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁর দুই হাত দিয়ে বাঘের গলা টিপে ধরে তার ব্যাদিত করাল বদন ও বিশাল দংষ্ট্রাকে প্রতিহত করতে লাগলেন।"

তারপরেই আরম্ভ হলো বাঘের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

কখনো তিনি বাঘের উপরে, কখনো বাঘ তাঁর উপরে, কিন্তু বাঘের গলাটি তাঁর হাতের বলিষ্ঠ কব্জার মধ্যে, আর কিছুতেই তিনি তাঁর গলার কাছে বাঘের মুখটা আনতে দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে লোকজন সব ঘটনাস্থলে এসে পড়েছে। বাঘের থাবার তীক্ষ্ণ নখরের আঘাতে যতীন্দ্রনাথের দেহ থেকে ক্ষরিত হচ্ছে অনর্গল রক্তধারা। খালি হাতে বাঘে আর মানুষে এরকম রোমাঞ্চকর লড়াই কেউ কখনো দেখে নি।

—ফটিক, গুলি কর্।

—দাদা, গুলি করব কি করে? তোমার গায়ে লেগে যেতে পারে।

সবাই বুঝল এমন অবস্থায় গুলি করা সত্যিই অসম্ভব। তখন শিকারবাহিনীর ভিতর থেকে একটি ছেলে চেঁচিয়ে তাঁকে বলে, বড়দা, আপনার শার্টের পকেটে ছুরি আছে মনে হচ্ছে। ছুরিটা বের করে নিন। তাইত, ছুরিখানার কথা তাঁর মনেই ছিল না এতক্ষণ। "যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ শুধু বাঁ হাত দিয়ে বাঘের গলা টিপে ধরে ডান

হাতে পকেটের ছুরিটা বার করলেন এবং কামড়ে ছুরিখানির ফলা খুলে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সবখানি বাঘের গলায় বসিয়ে দিলেন। ছুরির আঘাতে বাঘ উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং চারখানি থাবা দিয়ে যতীন্দ্রনাথের দেহ আঁচড়াতে আরম্ভ করল।"

এই আঁচড়ানোর ফলে তাঁর একটা উরুর বৃহৎ মাংসপেশীখানা ছিঁড়ে ঝুলে পড়ল ও অসম্ভব শোণিতস্রাব হতে লাগল। সেই ফলাকাটা ছুরির ফলা দিয়ে তিনি কিন্তু বাঘটাকে শেষ করলেন। বাঘের প্রাণহীন দেহটা যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, "তখন সকলে ছুটে এগিয়ে গেল। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্তস্রাব হচ্ছে। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে এনে শুইয়ে দিল।" দেখা গেল, আঘাত খুব গভীর ও মারাত্মক। গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসার পর যতীন্দ্রনাথকে সেইদিনই কলিকাতায় নিয়ে আসা হলো শোভাবাজারে তাঁর মেজমামার বাসায়। হেমন্তবাবু নিজে ডাক্তার ও সার্জন, তথাপি তিনি তাঁর ভাগিনেয়র চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারীকে 'কল্' দিলেন। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর দুটি পা-ই বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে এবং চিরকালের জন্য তাঁকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু বিধাতার সে অভিপ্রায় ছিল না।

ডাক্তার সর্বাধিকারী 'ফি' না নিয়ে এবং তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কথিত আছে, হেমন্তবাবুকে তিনি বলেছিলেন, এ ছেলে দেশের গৌরব। একে সুস্থ করে তুলতে পারলে সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের অধীনে তিনি তো রইলেনই, সেই সঙ্গে আরো একজন চিকিৎসকের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল শোভাবাজারে হেমন্তবাবুর বাসায়। "যতীন্দ্রনাথ যেদিন জখম হয়ে কলকাতায় এলেন, তার আটদিন পরে সহসা তাঁর গুরুদেব ভোলানন্দ গিরি হরিদ্বার থেকে শোভাবাজারে তাঁর মাতুলের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি

এসেই যতীন্দ্রনাথের পাশে গিয়ে বসলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, বেটা ভাল হয়ে যাবি। সেইদিন ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সারাদিন যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কাটালেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। সারাদিন সেই ঘরে তিনি পূজা হোম ধ্যান করলেন। পরদিন সকালে মহারাজ বললেন: ওকে কালো গরুর দুধ খেতে দাও; যত পার তত খাক। খুঁজে খুঁজে গোয়াবাগানের খাটাল থেকে কালো গরু বার করা হলো, তার দুধ যতীন্দ্রনাথকে পেট ভরে খাওয়ান হতে লাগল।"

ডাক্তার সর্বাধিকারীর নিপুণ চিকিৎসা আর গুরু মহারাজের আশীর্বাদে যতীন্দ্রনাথ প্রায় দু'মাস পরে আরোগ্য লাভ করলেন। সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রাচ্ নিয়ে তাঁকে হাঁটতে হয়েছিল, পরে অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটতে আরম্ভ করেন। একটা বিরাট ফাঁড়া কেটে গেল তাঁর জীবনে। বাঘের মুখ থেকে বাঁচা আর যমের হাত থেকে বাঁচা প্রায় একই কথা। ইতিহাস-বিধাতা যাঁকে দিয়ে দেশব্যাপী একটি বিপ্লব-যজ্ঞের সমাধা করাবেন, তাঁর ললাটে তো অপমৃত্যু লেখা থাকতে পারে না। এই ঘটনার পর থেকেই যতীন্দ্রনাথ 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হন। কথিত আছে, আরোগ্যলাভের পর তাঁর চতুর্থ মাতুল অনাথ চট্টোপাধ্যায় একদিন ভাগিনেয়কে বলেছিলেন, তোকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে পারা গেল বটে, কিন্তু সিঙ্গীর থাবা থেকে বাঁচান যাবে না।

মাতুলের এই আশঙ্কা তাঁর জীবনে সত্য হয়েছিল।

বাঘা যতীন!

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় শতাব্দীর পটে এই যে অসীম বীরত্ব আর দুঃসাহসের ছবি আঁকা হয়ে গেল, আজকের তরুণদের একবার সেই চিত্রটি স্মরণ করতে বলি। উপলব্ধি করতে বলি সেই উদ্দাম যৌবনের মহিমা আর সেই বিপ্লবী-বীরের অপরাজেয় মনোবল। শতাব্দীর পটে যখন এই দুর্বার যৌবনের ছবি আঁকা হয়, তখন

সেই শতাব্দীকে স্পর্শ করে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। বিদায়ের আগে বাংলার তরুণদের উদ্দেশে তিনি রেখে গিয়েছিলেন এই বাণী: "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।" অগ্নিময়ী এই বাণী যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ বুকে বিপ্লবের যে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল, অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে, সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে যোদ্ধমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ-ধন্য এই বিপ্লবী-নায়ক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে ঘুম ভাঙলে পরে বাঙালী দেখতে পেল যে বাংলার মানচিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে আরম্ভ করেছে। নূতন নূতন দৃশ্যপট জেগে উঠছে সেই মানচিত্রের উপরে। দেশের মাটিতে একে-একে আবির্ভূত হয়েছেন নবযুগের সব নূতন মানুষ—তাঁদের ললাটে ত্যাগের বিভূতি, কণ্ঠে নূতন কথা, চক্ষে নূতন দৃষ্টি আর হৃদয়ে অপরিসীম আত্মবিশ্বাস। এঁদের মধ্যে চিন্তানায়ক, কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ্ ও বিপ্লবী সবাই আছেন। আকাশে বাতাসে নূতন ভাব, নূতন সুর, নূতন গান। এই সবই যেন একত্র হয়ে একটা অগ্নিগর্ভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল। সুদূর ভবিষ্যৎ নয়, অতি আসন্ন ভবিষ্যৎ। বাঙালীর মনে লাগল নূতন রঙ—ইতিহাসের দিগন্ত উদ্ভাসিত হওয়ার উপক্রম হলো সেই রঙের বিচিত্র ছটায়।

একটি নবযুগের উদ্বোধন হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে।

নবযুগ তখনই আসে যখন দেশের মধ্যে যুগপৎ ঘটে একটি মহত্তর আবির্ভাব আর সেই সঙ্গে একটি বৃহত্তর ঘটনা। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই রকম মহত্তর আবির্ভাব আর বৃহত্তর ঘটনা। অরবিন্দ ছিলেন সেই প্রত্যাশিত আবির্ভাব আর স্বদেশী আন্দোলন ছিল সেই ঘটনা। অরবিন্দকে কেন্দ্র করেই সেদিন নব জাতীয়তার ভাব উত্তাল তরঙ্গ তুলে বয়ে গিয়েছিল বাংলার বুকে আর সেই স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে জেগে উঠেছিল বাঙালীর অন্তরে দাসত্ব-শৃঙ্খলমোচনের জন্য একটি অদম্য অভীপ্সা। এই অভীপ্সার পথ দিয়েই বিস্ফোরণের মতো দেখা দিয়েছিল আর একটি নূতন ভাব—বিপ্লববাদ। এই নবযুগের ফলশ্রুতিই ছিল সেই বর্ণাঢ্য অগ্নিযুগ।

বাঘা যতীন ছিলেন এই অগ্নিযুগেরই সন্তান।

একাধারে তিনি ছিলেন যোদ্ধা, নায়ক ও কুশলী সংগঠক।

অরবিন্দকে যদি আমরা বলি ক্ষত্রিয়ের রণগুরু, তা'হলে যতীন্দ্রনাথকে বলতে হয় সেনাপতি। অরবিন্দ যদি হন দ্রোণাচার্য, তাহলে যতীন্দ্রনাথকে বলতে হয় তাঁর সব্যসাচী শিষ্য। সাঁতারকাটা, চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়া, নক্ষত্রবেগে সাইকেল চালানো, শিকার, বন্দুক, রিভলবার ও পিস্তল চালানো, মল্লযুদ্ধ, লাঠি ও ছোড়াখেলা, বক্সিং—শারীরিক এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যিই সব্যসাচী। তাঁর শিকারকে তিনি কখনো একটার বেশি দুটো গুলি মারতেন না—এমনি ছিল তাঁর হাতের অব্যর্থ সন্ধান। "তেমনি তাঁর বজ্রমুষ্টি ঘুঁষির ওজনও ছিল বিরাশী-সিক্কা। সে ঘুঁষিতে অনেক ষণ্ডাগুণ্ডার নাক ভেঙেছে, কপাল ফেটেছে।" সেই সঙ্গে তাঁর মনের বলও ছিল অসাধারণ। সেনাপতি-সুলভ প্রতিভা ছিল তাঁর। স্বীয় মস্তিষ্কে চিন্তা করে সহকর্মীদের অভ্রান্ত নির্দেশ দিতে পারতেন তিনি আর পারতেন তাদের উদ্বুদ্ধ করতে, বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য সাহস ও উৎসাহ দিতে।

সেদিন বাংলায় যে নবযুগ এসেছিল, সেই যুগের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে সার্থক করে তোলার জন্য যেমন অরবিন্দের মতো একজন সর্বত্যাগী ও দূরদর্শী ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়েছিল তেমনি প্রয়োজন হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের মতো একজন দুঃসাহসী বীরের সেনাপত্য।

যতীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সরকারের একজন বেতনভোগী কর্মচারী, সেই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা। এই আন্দোলনের পটপ্রেক্ষায় ফুটে উঠেছিলেন ভবিষ্যতের বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতীন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসটা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

অগ্নিযুগের ইতিহাসও এর সঙ্গে বিজড়িত। আবার সর্বভারতীয় রাজনীতি অর্থাৎ কংগ্রেসী রাজনীতিও এই আন্দোলনের দ্বারা সেদিন অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। কাজেই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালী সন্তানের পরিচয় থাকা দরকার। এই প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে অনুভূত হয় এইজন্য যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে আমরা রাজনীতির যে ব্যবসাদারি রূপটা লক্ষ্য করি, বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে যে মনোবৃত্তি লক্ষ্য করি তা দেখে হতাশ হতে হয়। বহুতর রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারা অধ্যুষিত বর্তমানকালের রাজনৈতিক পরিবেশের গ্লানি ও ক্লেদ, অদূরদর্শিতা ও চাপল্য দেখে আমাদের কেবল এই কথাটাই মনে হয় যে, এঁরা রাজনীতি করেন বটে, কিন্তু এই দেশের রাজনৈতিক চিন্তার যে বনিয়াদ, এঁদের পায়ের তলায় আজ সেই বনিয়াদ নেই। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই সত্যটি হয় তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন, নতুবা জ্ঞানত অস্বীকার করেন। সব কিছুর উপরে দেশ—এই আদর্শটা আজ আমাদের সামনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তাই স্বদেশী আন্দোলনের সেই পুরাতন ইতিহাসটা এখানে একটু নূতন ভাবে বলতে চাই।

প্রাণ যখন জাগে, তখন হিসাব করে জাগে না।

মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে যত রকমের জাগরণের সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত, তার প্রত্যেকটি এইভাবে ঘটেছে। অন্তরের গূঢ় প্রেরণা ইতিহাসের জারকরসে জারিত হয়ে এই জাগরণকে হঠাৎ আমাদের সামনে নিয়ে আসে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল এমনি একটি প্রাণ-জাগার কাহিনী। ইতিহাসের প্রত্যেক বৃহৎ ও মহৎ ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ এবং এই প্রক্রিয়া ভিন্ন কোন আন্দোলনই—তা সে সামাজিক আন্দোলন হোক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন হোক কিংবা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আন্দোলন হোক—একটি যথার্থ আন্দোলন হিসাবে সার্থকতা লাভ

করে না। সাময়িক উত্তেজনা আর উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলন এক জিনিস নয়—ছুটোর চরিত্র পৃথক ও পরিণতিও স্বতন্ত্র। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল, এমনি একটি উদ্দেশ্যমূলক ও পরিণাম-অন্বিত আন্দোলন, সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগমাত্র ছিল না।

ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই শুরু করা যাক।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দী।

বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আসন্ন হয়ে এল একটা বিরাট পরিবর্তন। বিগত শতাব্দীর শেষ দশটি বছরে ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাসে যে বিরাট তরঙ্গ উঠেছিল তা স্পর্শ করল নূতন শতাব্দীকে। জাতীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবোধ তখন প্রভাতসূর্যের দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে ইতিহাসের পটে। ১৯০২ সালটি বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে প্রধানত চারটি কারণে; যথা—স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু, কলিকাতার শিবাজী উৎসব, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (যাহা র‍্যালে কমিশন নামে পরিচিত) এবং আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন; এই অধিবেশনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার সভাপতিত্ব করেন।

১৯০২, ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুতে সমস্ত বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। বরোদায় অরবিন্দের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি বুঝলেন, বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মতো ছিলেন এবং যাঁর কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, সেই কর্মযোগী বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাবার আর কেউ নেই। ভারতপ্রেমিক এই সন্ন্যাসীর ভাবধারা, তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ, তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম যে তিনটি চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল তাঁরা হলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মাবান্ধব, ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দ। এই তিনজনের সঙ্গে আরো একটি তরুণের নামের উল্লেখ করতে হয়। তিনি যতীন্দ্রনাথ। তিনি তখন বাইশ বছরের যুবক, হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার।

অরবিন্দের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের পরিচয় এই : "বিরাট প্রাণ-পুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করিতে হয়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দই—নর-কেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার প্রভাব আজো প্রবলভাবে কাজ করিতেছে। সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব, বিবেকানন্দ এখনো বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশ-জননীর আত্মায়, দেশ-জননীর সন্তানদের আত্মায়।"

উপাধ্যায় আর নিবেদিতা দু'জনেই বেলুড়বাহিনীর তীরে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর শেষকৃত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং প্রজ্জ্বলিত সেই চিতাগ্নি থেকে একই সঙ্গে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন। উভয়েই নিঃশব্দে সন্ন্যাসীর চিতাভস্ম অঙ্গে ধারণ করে তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্পন্ন করার পবিত্র প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। উপাধ্যায়, অরবিন্দ ও নিবেদিতা—এই তিনজনই ছিলেন বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চেতনার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি এবং এই তিনজনই আবার স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে একে সার্থকতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ইতিহাসে এই তিনটি নাম তাই চিরকালের জন্য ভাস্বর হয়ে আছে।

আর আমাদের আলোচনার নায়ক, যুবক যতীন্দ্রনাথ কি করলেন?

তিনি তখন তাঁর মনের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করতে লাগলেন স্বামীজির সেই কথাগুলি যা তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে মেঘমন্দ্রিত স্বরে বাঙালী যুবকদের উদ্দেশে বলেছিলেন : "নির্বীর্যতা আধ্যাত্মিকতা নয়। দুর্বলতা মহাপাপ। তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ দুই-ই আজ পরিহার্য—ভারতে রজোগুণের চর্চার প্রয়োজন।" আমরা অনুমান করতে পারি যে, সন্ন্যাসীর এই কথাগুলি সেদিন এই তরুণের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ জাগিয়ে তুলেছিল। সাতকোটি বাঙালীর মধ্যে তিনি মানুষ হয়ে ফুটে উঠতে চাইলেন। নিজেকে

তিনি অগ্নিকমল করে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন এবং সেইসঙ্গে আরো অনেককে। তখন থেকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবধারা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে থাকেন। এই সময় থেকেই বাঘা যতীন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি পাথেয় যে বিবেকানন্দের ভাবধারা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এইবার শিবাজী উৎসবের কথা।

মহামতি টিলক মারাঠাজাতির মধ্যে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ঐ দেশে শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন ১৮৯৫ সনে। সাত বছর পরে দেখা গেল যে তার তরঙ্গাভিঘাত এসে লাগল বাংলাদেশে। টিলকের নেপথ্য প্রেরণায় কলিকাতায় এর প্রবর্তন করেন আরেকজন স্বনামধন্য মারাঠী সন্তান যিনি বাংলাদেশকে ও বাঙালী জাতিকে ভালোবেসে একরকম বাঙালীই হয়ে উঠেছিলেন। এই বিস্মৃত এবং উপেক্ষিত দেশপ্রেমিকের নাম সখারাম গণেশ দেউস্কর। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে উপাধ্যায়, নিবেদিতা ও অরবিন্দের সঙ্গে এই নামটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। তাঁর রচিত 'দেশের কথা' বইখানি সেদিন এই আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মুখে লেখক এই কথা শুনেছেন। ১৯০২ সালে তাঁরই উদ্যোগে মারাঠার এই বীরপূজা বাংলাদেশে প্রথম শুরু হয়। বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করেন। এই উপলক্ষ্যে রচিত কবির 'শিবাজী' কবিতাটি বাংলা-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। মারাঠীর সঙ্গে বাঙালীর জাতীয়তা-বোধের রাখীবন্ধন দৃঢ়তর হয় মুখ্যত এই উৎসব এবং উদ্দীপনাময়ী কবিতাটির মাধ্যমে।

পর পর কয়েক বছর ধরেই কলিকাতা ও মফঃস্বলে বছরে একবার করে শিবাজী উৎসব হয়েছিল। সেদিন এর প্রয়োজন ছিল।

মারাঠার নূতন হাওয়া বাংলায় এসে লাগল। ১৯০৬ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে উৎসবটি হয়েছিল, সেইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উৎসবে টিলক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৮ সনে টিলকের গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের পর থেকেই বাংলাদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে তাঁর প্রভাবও। মুক্তিকামী সমগ্র ভারতবাসীর দৃষ্টি তখন বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছিল এই একটি মানুষের প্রতি। বিগত শতকের শেষপাদে যখন তিনি গণপতি উৎসব এবং তার কিছু পরে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন তখন থেকেই মারাঠাদের ভিতর জাতীয়তাবোধ এক নূতন ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে—একটা নূতন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিতে থাকে তাদের মধ্যে। গণপতি উৎসব পেশোয়াদের আমলে প্রচলিত ছিল, ইংরেজ আমলে বন্ধ হয়ে যায়। টিলক সেই উৎসবের পুনঃ প্রচলন করেন।

সেই সময়ে তিনি তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় 'জাতীয় উৎসবের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে দু'টি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটিতে তিনি বলেছিলেন: "যে মানুষ তার দেশের ধর্মের জন্য গর্ব বোধ করে না, সে তার দেশের জন্য গর্ব বোধ করবে কেমন করে? ধর্ম ও জাতীয়তা এক সূত্রে বাঁধা।" এই কথা যখন তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ তখন জীবিত এবং সেই সন্ন্যাসীর কণ্ঠেও আমরা ঠিক এই ধরনের কথা তখন শুনেছি। টিলকের পরে, এই চিন্তার সূত্র ধরে, অরবিন্দও ঠিক এই কথা আমাদের বলেছিলেন: "ধর্ম ও জাতীয়তা এক সূত্রে গাঁথা"। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে এই ভাবটি বিশেষভাবেই কার্যকরী হয়েছিল। সমকালীন আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি সেদিন বিশেষভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল এই নূতন চিন্তার দ্বারা।

১৯০৬ সনে শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে টিলক এলেন কলিকাতায়। মহানগরীতে সেই তাঁর প্রথম আগমন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য

বিরাট আয়োজন হয়েছিল। এবারকার উৎসব তাই খুব জমকালো হয়েছিল। বাল গঙ্গাধর টিলকের প্রভাবে বাঙালী তরুণদের অন্তরে এক নূতন শক্তির শিখা জ্বলে উঠল। শিবাজীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী তরুণ এক নূতন শক্তিমন্ত্রের উপাসক হলো। শিবাজীর বীর-চরিত্র তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গেল। শিবাজীর প্রতিমূর্তি গড়ে সারাদিনব্যাপী উৎসব হোল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাঙালী ছেলেমেয়েরা নানা রকমের দৈহিক ক্রীড়া দেখাল। একটা সুসজ্জিত মণ্ডপের তলায় শিবাজীর প্রতিমূর্তির পাশে তাঁর বিখ্যাত তরবারিকে রাখা হোল। সকলে পুষ্পমাল্য দিয়ে সেই তরবারিকে পূজা করলেন। তরুণদের পক্ষ থেকে বাঘা যতীন এগিয়ে এলেন সেই তরবারিকে পুষ্পার্ঘ্য দেবার জন্য। সেই সময় পুলিশ এই জাতীয় উৎসবের উপর কড়া নজর রাখত। কোন সরকারী কর্মচারীই ভয়ে এই উৎসবে যোগদান করতে সাহস করত না। যতীন্দ্রনাথও সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু পুলিশের উৎপাতকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি এগিয়ে এলেন এবং রক্তজবা দিয়ে সেই তরবারিতে প্রদান করলেন অর্ঘ্য। সেই সঙ্গে নিজের হৃদয়ও। পুলিশ সেইদিন থেকেই (১৯০৬) সেই বলিষ্ঠ-দেহী তরুণটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে থাকে।

১৯০২ সনের অপর দুইটি ঘটনা—বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও আমেদাবাদ কংগ্রেস। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সভাপতিরূপে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর সেই ভাষণের উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এদেশে তিনিই এই সত্যটা অনুভব করেছিলেন যে, ভিক্টোরিয়া যুগের অবসান হয়েছে এবং এখন নূতন যুগ নূতন চিন্তা নিয়ে আসছে। এমন কি অনাগত

যুগের নেতার আগমনীও ঝঙ্কৃত হয়েছিল তাঁর সেই বক্তৃতার মধ্যে। "কোথায় সেই প্রতিভাবান নেতা যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে নিয়ে আসবেন একটি নূতন ও উন্নততর নবযুগ?" তিনি কি নবযুগের নূতন নেতা অরবিন্দ ঘোষের কথা চিন্তা করেছিলেন? হয়ত করেছিলেন।

১৯০৩।

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের পটভূমিকায় দিল্লীতে সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে দিল্লীতে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে একটি দরবারের আয়োজন হয়। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। অভিষেকের উৎসবটা লণ্ডনেই বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে হয়েছিল। ভারতবর্ষে সুরেন্দ্রনাথ, লণ্ডনে রমেশচন্দ্র দত্ত—দু'জনেই এই অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করেছিলেন: "দরবার তো নয়, এ যেন ভারতবাসীকে বিদ্রূপ"—এই কথা বলেছিলেন রমেশচন্দ্র। এই বছরের শেষভাগেই লর্ড কার্জন উত্থাপন করলেন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।

১৯০৪। মার্চ মাস।

জনমতের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয় এবং তার ফলে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল অসন্তোষ।

১৯০৫।

জনমত অগ্রাহ্য করে কার্জনী বিধান—বঙ্গভঙ্গ—সরকারীভাবে ঘোষিত হয়। এই বিস্ফোরক পরিবেশেই দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন। অতঃপর আমরা এই আন্দোলনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

ইতিহাসে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটে যার পরিণাম কখনো হিতে বিপরীত, আবার কখনো বিপরীতে হিতরূপ দেখা দেয়। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিধানটা ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর। বাঙালীর নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি যেন একে আরো তীব্রতর করে তুললেন। আমরা দেখতে পাব যে, এই কার্জনী প্রস্তাবের পথ দিয়েই এক নূতন ভাবের প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চলেছিল সারা বাংলার বুকের উপর দিয়ে।

১৯০৩। ৩রা ডিসেম্বর।

লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এলো বঙ্গচ্ছেদের উদ্যত খড়্গাঘাত।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটা সরকার প্রথম ঘোষণা করলেন। প্রস্তাবটা ছিল এই ঃ বাংলা থেকে সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ বিচ্ছিন্ন করে উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটি এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ এই দুটি জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রদেশ—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা—এই তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল তখনকার বাংলা। কার্জন ওজুহাত দেখালেন যে, এতবড়ো একটা প্রদেশ ঠিকভাবে শাসন করা চলে না। তাই শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা হবে বলে তিনি বঙ্গভঙ্গের জন্য একটি প্রস্তাব করে বিলাতে ভারতসচিবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে দেখা দিল তুমুল বিক্ষোভ। বাংলার শিক্ষিত সমাজ জানাল প্রতিবাদ। অজস্র প্রতিবাদ সভার আয়োজন হয় সারা বাংলা দেশে। এক প্রাণ, এক মন নিয়ে বাঙালী শতকণ্ঠে জানাল একই প্রতিবাদ। হাজার হাজার লোকের

সই-করা দরখাস্ত গেল বিলাতে ভারতসচিবের কাছে প্রস্তাবের বিরোধিতা জানিয়ে। দরখাস্ত প্রেরিত হওয়ার পর থেকে উৎকণ্ঠায় সবাই অপেক্ষা করতে থাকে। ১৯০৪ শেষ হয়ে আরম্ভ হয় ১৯০৫। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে ১৯০৫-এর ২০শে জুলাই বিলাত থেকে সংবাদ এল—পার্লিয়ামেণ্ট কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

প্রতিবাদ নিষ্ফল হোল।

অমনি বাঙালীর কণ্ঠে গর্জন শোনা গেল—এই কার্জনী বিধান আমরা রদ করবই। কার্জন এদেশে আসার পর উপলব্ধি করলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতে নিরাপদ করতে গেলে বাঙালীকে একটু শায়েস্তা করতে হবে, সংযত করতে হবে; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের ভাবটা আরো তীব্র করে তুলতে হবে। কিন্তু কার্জন চালে ভুল করেছিলেন। বাঙালীর প্রকৃতিটা তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি। পারলে পরে আগুন নিয়ে অমনভাবে খেলা করতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই আগুনে শেষ পর্যন্ত তাঁরই মুখ পুড়ে গিয়েছিল॥ বিলাত থেকে সংবাদ আসা মাত্র দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে বাঙালী দুর্জয় পণ করল— বঙ্গভঙ্গ তারা রদ করবেই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল সংগ্রাম করে বাঙালী এই বিধান রদ করতে সত্যিই সক্ষম হয়েছিল। সেদিন বাঙালী যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, আধুনিক ভারতবর্ষে তার তুলনা বিরল। এই আন্দোলনের ফলেই, বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে, সত্যিকার জাতীয়তাবোধ বা ন্যাশনালিজম্ ভারতের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে একটি ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

অনেকে বলে থাকেন, লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন বলেই না এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। আমরা কিন্তু ইহা মনে করি না। তিনি ছিলেন উপলক্ষ্য মাত্র। "দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী জাতি স্বাধীনতার তপস্যায় হোমাগ্নির যে সমিধ সঞ্চয়

করিয়াছিল, এই বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাই আজ পূর্ণবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বহুকালের জাতীয় অপমান ও নির্যাতনের ফলে জাতির চিত্তে যে রুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত হইতেছিল, বঙ্গভঙ্গের আঘাতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত তাহাই আজ প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিল এবং দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিল।" মোট কথা, ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, কার্জনী বিধানে বঙ্গভঙ্গ যদি নাও ঘটত, তথাপি বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এইরূপ একটি বিস্ফোরক আন্দোলন অবশ্যই দেখা দিত। কারণ এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল।

দেখতে দেখতে ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়।

আন্দোলন পরিণত হয় প্রজ্জ্বলিত অবস্থায়।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তার শিখা।

বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে নবজাগরণের প্রাণসংগীতে।

উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্', বিপ্লবীদলের 'যুগান্তর' চমকের পর চমকের সৃষ্টি করতে থাকে। আর রবীন্দ্রনাথ গানে গানে আঁকলেন আন্দোলনের একটি মহিমান্বিত রূপ। বাঙালীর হৃদয়-বীণাটিকে তিনি বেঁধে দিলেন একটি সুরে। তারই ফলে দেখা গিয়েছিল ঐক্যবোধ ও একাগ্রচিত্ততা। একমন, একপ্রাণ—এই ছিল পঞ্চবর্ষব্যাপী সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। এই আন্দোলনের মাঝখানে আমরা আরেকজনকে পেয়েছিলাম। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। তাঁরই কণ্ঠে আমরা সেদিন শুনেছিলাম—"স্বদেশী তোমার জীবন-মরণ সংগ্রাম।" আরো শুনেছিলাম— "কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা আর অসম্ভব ত্যাগ স্বীকারের পথ দিয়া চলিতে হইবে। স্বদেশী তোমার কাছে চায় প্রাত্যহিক জীবনে বীর্যের সাধনা।" আর অরবিন্দের কণ্ঠে শুনলাম: "ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।" সমকালীন রাজনীতিতে নিবেদিতা ও অরবিন্দের লেখনী ও

কণ্ঠকে আশ্রয় করে সেদিন যে সুর বেজেছিল, তা ছিল একেবারেই নূতন। নূতন ও উদ্দীপনাময়ী।

১৯০৬, ৪ঠা জুন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় লোকমান্য টিলক এলেন কলিকাতায়। তাঁর আগমনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। আগুন জ্বলে উঠল—দিকে দিকে বিস্তার লাভ করল তার লেলিহান শিখা। এইসময়ে অরবিন্দ-অনুজ বারীন্দ্র বরোদা থেকে কলিকাতায় এসে গোপনে ছাপিয়ে বিলি করতে থাকেন 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা। এই পুস্তিকা বরোদায় বসে রচনা করেছিলেন অরবিন্দ ১৯০৫-এর শেষ ভাগে। বাঙালী তরুণ এই পুস্তিকায় পাঠ করল : "কংগ্রেসী প্রথায় দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হতে হবে। ফরাসী বিদ্রোহের মতো একটা সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হবে ; তবেই ভারতবর্ষ ইংরেজকে তাড়িয়ে স্বাধীন হতে পারবে।" দেখা যাচ্ছে, অরবিন্দ শুধু বৈপ্লবিক ভাবের প্রবর্তক নন, পরন্তু তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক কর্মেরও প্রবর্তক। শুধু প্রবর্তক নন, নেতাও।

এইবার স্বদেশী আন্দোলনের গর্ভ থেকে বাংলার মাটিতে জন্ম নিল সশস্ত্র বিপ্লব। আন্দোলন যতই ব্যাপক হতে থাকে, সরকারী দমননীতি ততই প্রশস্ত হতে থাকে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ হোল, পুলিশের লাঠিতে নিরস্ত্র বাঙালী তরুণের রক্ত ঝরল, রেগুলেশন আইনে নেতাদের ধরে শুধু আটক করা নয়, বাংলার বাহিরে বহুদূরে তাঁদের নির্বাসিত করা হোল। সংগ্রাম অস্ত্রহীন, কিন্তু তা চলতে থাকে বিদ্যুৎগতিতে—নরমপন্থী ও চরমপন্থী সকল নেতাই এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এর পুরোভাগে সেদিন। সমস্ত বাংলাদেশ তখন হয়ে উঠেছিল একটা বারুদের স্তূপ। ১৯০৫-এর পর থেকেই আন্দোলন আর বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না—নিল একটি সর্বভারতীয় রূপ।

এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা

সহজে নিভল না। চরমপন্থীরা বললেন, শুধু বয়কট আর বিলিতি কাপড় ও বিলিতি নুন বর্জন করে কোন কাজ হবে না। তাই তাঁরা ইংরেজ-শাসন উচ্ছেদ করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করলেন। সকল দেশেই জাতির অগ্রগামী চিন্তা বিপদের ঝড়কে সঙ্গে করেই প্রবাহিত হয়। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেসব অগ্রগামী চিন্তা ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লব। স্বদেশী আন্দোলনই বাংলাদেশে এর জন্ম দিয়েছিল। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, আমরা যখন এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিচার-বিশ্লেষণ করি তখন দেখতে পাই যে, সেদিনের স্বৈরাচারী শাসনই বাংলাদেশে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল।

১৯০৫-এর শেষভাগেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত-সমিতি এবং ১৯০৬ থেকেই বাঘা যতীন এই সমিতিতে যোগদান করেন। তবে ১৯১০-এর আগে অর্থাৎ আলিপুর বোমার মামলার আগে তিনি বিপ্লবে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। মি. মিত্রের অনুশীলন সমিতিতে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূল বাতাসে তাই-ই বিপ্লবী গুপ্তসমিতিতে রূপান্তরিক হয়ে যায়। ১৯০৬-এর পর থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি গুপ্ত-সমিতি আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশের প্রায় সর্বত্র এই জাতীয় সমিতি বহুবিধ নাম নিয়ে দেখা দিতে থাকে। এইসব সমিতি-গুলির মধ্যে 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর' দলই ছিল সকল দিক দিয়ে অগ্রণী। বাঘা যতীন 'যুগান্তর' দলের সভ্য ছিলেন।

বাংলার তরুণ দল স্বদেশী আন্দোলনকে পুরাতন প্রথার পরিবর্তনের সুযোগ বলে মনে করল। বাংলার নানাস্থানে গুপ্ত-সমিতি গঠিত হোল। বাংলায় স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বয়কট আন্দোলন দমনের জন্য শাসক-সম্প্রদায়ের চণ্ডনীতি যত প্রবল হতে থাকে, অলক্ষ্যে এই বিপ্লবীদলের কর্মতৎপরতাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই কর্ম-তৎপরতা যে কয়টি ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি এখানে

উল্লেখ্য। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের ছোটলাট হন স্যর বমফিল্ড ফুলার। ফুলারী শাসনে সমস্ত পূর্ববঙ্গে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ফুলার-নিধনের চেষ্টা চলতে থাকে। তাঁকে হত্যা করবার জন্য ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ একজন সহকর্মীকে নিয়ে রংপুর যাত্রা করেন। কিন্তু ফুলার সাহেব ভিন্ন পথে তাঁর গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছান। ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯০৭; ৬ই ডিসেম্বর।

ছোটলাটের স্পেশাল ট্রেন যাবে মেদিনীপুরের উপর দিয়ে। সংবাদটা এলো বিপ্লবীদের কেন্দ্রে। ঠিক হোল, বোমা দিয়ে ঐ স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দিতে হবে। ভীষণ বিস্ফোরক দুটি বোমা সঙ্গে দিয়ে দু'জন বিপ্লবী কর্মীকে পাঠান হোল নারায়ণগড় স্টেশনে। লাটের স্পেশাল যাওয়ার সময়ে নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ঐ ট্রেন ধ্বংস করার চেষ্টা হয়। বোমা নিক্ষিপ্ত হোল রাত্রির অন্ধকারে, বিদীর্ণ হোল প্রচণ্ড শব্দে এবং ট্রেনও লাইনচ্যুত হোল, কিন্তু লাটসাহেব বেঁচে গেলেন। এই ঘটনার ঠিক সতের দিন পরে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেবকে গোয়ালন্দ স্টেশনে হত্যার চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরেই কুষ্টিয়ায় পাদ্রী হিগেনবোথানকে গুলি করা হয়।

অতঃপর চন্দননগরে স্বদেশী সভার অনুষ্ঠান-আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করায় ১৯০৮ সনের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভিলের বাংলোয় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তখন কলিকাতার পর পশ্চিমবঙ্গে এই চন্দননগর ছিল বিপ্লবযজ্ঞের একটি বিরাট পীঠস্থান। এর পরের বিখ্যাত ঘটনা হোল মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ। কিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—এই দু'টি শহীদ-যুগলের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে এই বিখ্যাত ঘটনার সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে মজঃফরপুরের ঘটনার পর থেকেই সারা ভারতবর্ষ চমকে উঠেছিল। ডি. এস. কিংসফোর্ড তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছিলেন

ভয়ানক অত্যাচারী। অত্যাচারী এবং অভদ্র। সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে ভারতীয়দের অবমাননা ও লাঞ্ছনা করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করতেন না। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকার সময়ে এই কিংসফোর্ড সাহেব 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির অভিযুক্ত সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কঠোর দণ্ড দেন। এঁরই আদেশে তেরো বছরের নিরপরাধ কিশোর বালক সুশীল সেনকে আলিপুর জেলে ধরে নিয়ে গিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল।

এই ঘটনায় বাংলার তরুণদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ বিক্ষোভ আর উত্তেজনা। উত্তেজিত যুগান্তর ও মেদিনীপুর গুপ্ত-সমিতির সভ্যগণ স্থির করলেন—কিংসফোর্ডকে এই পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, মায়ের চরণে তিনিই হবেন প্রথম শ্বেতবলি। প্রথমে চেষ্টা হোল একটা 'বই-বোমা' পাঠিয়ে। তাতে কিছু হোল না। কিংসফোর্ড তখন আলিপুরের জজের পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হোল যে কলিকাতা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তিনি লাটসাহেবের কাছে বদলির জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁকে তখন মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট করে সেখানে বদলি করা হয়। বিপ্লবীদের বাহু বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত প্রসারিত হোল। কিংসফোর্ডকে নিধন করার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম নিয়ে মজঃফরপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী—এই দুই বিপ্লবী কর্মীকে। তাঁরা দু'জনেই শপথ নিলেন : হয় মৃত্যু, না হয় কার্যসিদ্ধি। যে গুপ্ত বিচারালয়ে কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি হয়েছিল তাতে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, চারু দত্ত ও সুবোধ মল্লিক।

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয় কলিকাতা থেকে মজঃফরপুরে।

মুরারিপুকুর বাগানের বিপ্লবকেন্দ্র থেকে মজঃফরপুরে প্রেরিত হন মৃত্যুর দূতের মতো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। অলক্ষ্যে স্পন্দিত হয় বাংলার ইতিহাস। সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক

অর্ধশতাব্দী কাল পরে একটা বিরাট ঘটনা ঘটবার উপক্রম হোল।

১৯০৮। ৩০শে এপ্রিল। রাত্রিকাল।

মজঃফরপুরে বদলি হয়ে আসার পর থেকে কিংসফোর্ড সর্বদা সতর্ক থাকতেন। ক্লাব আর নিজের বাংলো ছাড়া আর কোথাও বেরুতেন না তিনি। ক্লাব থেকে রাত্রিকালে ফিটন গাড়ি করে সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলোয় ফেরেন। রাস্তার ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল। দূরে একটা ফিটনের শব্দ শোনা গেল। বিপ্লবীযুগল সতর্ক হলেন। দু'জনেই পকেট থেকে বের করে নিলেন হাতবোমা। হেমচন্দ্র কানুনগোর তৈরী ছিল এই বোমা। ফিটন আসছিল ঠিকই, কিন্তু কিংসফোর্ডের ফিটন নয়। তাই ভুল হোল। দু'টি ইংরেজ মহিলা—মিসেস কেনেডি ও তাঁর কুমারী মেয়ে—নিহত হলেন সেই বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকিকে মোকামা স্টেশনে দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জি যখন গ্রেপ্তার করতে যান তখন—"আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন?"—এই বলে তিনি নিজের রিভলবারে আত্মহত্যা করেন। হয় মৃত্যু, না হয় কার্যসিদ্ধি—শহীদ যুগল অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। মাতৃপূজার প্রথম বলি এই শহীদ যুগল। আত্মদান করে তাঁরা আত্মদানের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লববাদকে নিঃসন্দেহে তা নৈতিক প্রেরণা দিয়েছিল।

"পুলিশ এবার বেড়াজাল ফেলল। কলিকাতার মানিকতলায় মুরারীপুকুর বাগান ও আরো বহুস্থানে খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তার হল। বোমার আড্ডা ও বহুতর লোক ধরা পড়ল। অরবিন্দ বাবুও গ্রেপ্তার হলেন।.... মুরারীপুকুর বাগানে পাওয়া যায় বোমার খোল ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট,

বিস্ফোরণ শিক্ষার বই ও গুপ্ত-সমিতি গঠন প্রণালী।" সবশুদ্ধ বিয়াল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯০৮ সনের মে মাসের গোড়ার দিকেই। এই গ্রেপ্তার পর্ব সমাধা হয়; শুরু হয় ইতিহাস-বিখ্যাত মানিকতলা বোমার মামলা। আলিপুরের সেসন জজ বীচক্রফটের আদালতে এই মামলা দীর্ঘ দু'বছর ধরে চলেছিল। সেজন্য ইহা 'আলিপুর বোমার মামলা' বলে সমধিক পরিচিত। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এটাই হোল প্রথম চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা। বাংলাদেশে অরাজকতা হয়েছে, এই ওজুহাতে এই সব ধর-পাকড়ের সঙ্গে ভারত সরকার এই সময়ে প্রবর্তন করেন ক্রিমিন্যাল ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট, ১৯০৮, অর্থাৎ পরিবর্তিত ফৌজদারি কার্যবিধি এ আইন পাশ করার পর, বিপ্লবকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য সরকার আরো অগ্রসর হলেন। "সারা বাংলার অনুশীলন সমিতি, কলকাতায় আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহের সাধনা-সমিতি, সুহৃদ-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি প্রভৃতি এতদ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হয়।"

আলিপুর বোমার মামলার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, এই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ—পরবর্তী কালে যিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যায় বিভূষিত হয়েছিলেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলায় তিনি যে সওয়াল করেছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে অপরাধ নয় এবং এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস যে মানুষের জন্মগত অধিকার—এই সত্যকেই সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় ও সুনিপুণ যুক্তির সঙ্গে আদালতের সামনে তুলে ধরেছিলেন। যখন তিনি তাঁর সওয়ালের উপসংহারে আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে আদালতকে ও জুরিদের সম্বোধন করে বলেন, "আজিকার এই তুমুল বিতর্ক একদিন স্তব্ধ হইয়া যাইবে, এই উত্তেজনা

থামিয়া যাইবে এবং প্রধান আসামীও ইহজগতে তখন থাকিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সকলেই দেশাত্মবোধের কবি, জাতীয়তাবোধের গুরু ও মনুষ্যসমাজের প্রেমিক মানুষ হিসাবে স্মরণ করিবে।”

এই বোমার মামলার জন্যই পাঁচ বৎসর ব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসে পেয়েছে একটা নূতন ব্যঞ্জনা, নূতন মহিমা। সেই মহিমার কথা বলতে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, “এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজচিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন সহস্র দল কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছে। বাংলাদেশের অগ্নিসাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যে আদর্শ নিজেদের মধ্যে গড়িয়াছেন, যেভাবে তাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আপনাদের অস্থিপঞ্জর জ্বালাইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন—তাহা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন আন্দোলন মাত্র ছিল না, ইহার অধিক কিছু। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা বাঙালীর একক সাধনা।”

এই সাধনার উত্তরাধিকার লাভ করে বাঘা যতীন বাংলার বিপ্লবযজ্ঞে কি ভাবে নেতৃত্ব করেছিলেন, অতঃপর আমরা তাঁর জীবনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

"এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্তভাবনাহীন।"

কবির এই কথা বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষেও প্রযোজ্য। লক্ষ না হলেও, অন্তত কয়েকশত বাঙালী তরুণ এই শতকের সূচনা থেকে দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিককাল ধরে জীবন মরণ খেলায় মেতে উঠেছিলেন নিঃশঙ্ক চিত্তে। সে ইতিহাস তো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বাঘা যতীন ছিলেন এঁদেরই একজন এবং অনেক বিষয়ে প্রধান একজন। আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই তিনি খুব তৎপর হয়ে উঠতে থাকেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে সেদিন তিনি যে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। মজঃফরপুরের ঘটনার পর থেকে সরকারের দমননীতি, বিশেষ করে বিপ্লবীদের সম্পর্কে সরকারের আক্রোশ ও আঘাত যখন তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে উঠতে থাকে, বাঘা যতীন ঠিক তখন থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন এবং "প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে গভর্ণমেণ্টের উপরে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে দিলেন।"

কিন্তু তার আগের কথা একটু বলা দরকার।

বাংলায় বিপ্লবের তিনটি স্তর।

রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ধ্যান-ধারণার মধ্যে আছে বিপ্লববাদের প্রথম স্তর। এই রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত আলিপুর বোমার মামলা চলবার সময়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। এই রাজনারায়ণ বসুর অন্যতম দৌহিত্র সন্তান অরবিন্দ বাংলাদেশে বিপ্লববাদের বীজ বপন করেছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের

অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' তো বিপ্লবীদের ইষ্টমন্ত্র ছিল। টিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি মুখ্যত বৈপ্লবিক ভাবের প্রবর্তক—এই হোল বিপ্লবযুগের দ্বিতীয় স্তর। এই দ্বিতীয় স্তরেই বাঙালী তরুণদের অন্তরে ক্ষাত্রবীর্যের সঞ্চার করেছিলেন অরবিন্দ তাঁর সাপ্তাহিক বন্দেমাতরম্ ও কর্মযোগিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে। 'সুপ্রভাত' শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: "যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় এবং এই মূল্য না দিতে পারলে স্বাধীনতা লাভ কোনদিনই সম্ভব হবে না। রাজনীতি হলো ক্ষত্রিয়ের এবং ক্ষাত্রবীর্যের অনুশীলনের দ্বারাই স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব—বেনিয়াবৃত্তির সাহায্যে সস্তা বাজারে স্বাধীনতা কেনা যায় না।" তাঁর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকার মধ্যেও অরবিন্দ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর এর তৃতীয় স্তর ছিল যথার্থ বৈপ্লবিক কর্ম, ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে 'রেভোলিউশন ইন য়্যাকশন'। এই বৈপ্লবিক কর্ম-প্রয়াস বাংলা দেশে আরম্ভ হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই। এই কর্মযজ্ঞে যাঁরা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন বাঘা যতীন ছিলেন তাঁদেরই নেতৃস্থানীয়।

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রচারক ও প্রবর্তক হিসাবে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানও কম ছিল না। সার্কুলার রোডে তাঁর বাসা-বাড়িতে তিনি যে রাজনৈতিক স্কুল খুলেছিলেন, সেখানে যতীন্দ্রনাথ পড়াতেন রণনীতি, এ কথা আগেই বলছি। ১৯০২ সনে বরোদায় ছদ্মনামে মিলিটারি ট্রেনিং লাভ করে তিনি কলিকাতায় আসেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর নামে অরবিন্দের কাছ থেকে একখানি পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলায় আসেন। এই ১৯০২ সনেই বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করবার সময়ে অরবিন্দ পুণার ঠাকুর-সাহেবের গুপ্ত-সমিতির দীক্ষিত সভ্য হন। চাকরী ছেড়ে তিনি বাংলায় আসেন ১৯০৫ সনে। তখন এখানে গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তার আগে ১৯০৩ সনে কয়েকদিনের জন্য তিনি

কলিকাতায় আসেন। বাঘা যতীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনই হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে 'বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "১৯০৩ সালে যোগেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়িতে ভাবী যুগান্তরকারীদের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটল। বিদ্যাভূষণ আগে থেকে কেবল বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে বেড়াতেন। কত প্রবন্ধ ও বই লিখেছিলেন। তারমধ্যে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির কথা বাংলা ভাষায় সকলের সামনে আনতে তিনি সক্ষম হন। এঁর বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ আসেন। সেখানে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভাবী কালের 'বাঘা যতীন' এঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে যতীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলেন বাঘা যতীন।"

বাংলায় বিপ্লববাদের জন্মদাতা হিসাবে কোন একজনকেই এই গৌরবে ভূষিত করা চলে না। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালীর ভাবজগতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম আলোড়নের সৃষ্টি করে। উপরে যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথা বলা হয়েছে, তিনি শুধু বঙ্কিমযুগেরই একজন লোক ছিলেন না, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন; বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচূড়া বাসকালীন সময়ে (তখন বঙ্গগৌরব ভুদেব মুখোপাধ্যায়ও ঐখানে বসবাস করতেন) বিদ্যাভূষণ তাঁর সঙ্গে একটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেটি হলো সাহিত্যের মাধ্যমে দেশপ্রেম সৃষ্টি করা। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পরে, এই কথাই বলা যায় যে, তৎকালীন সাহিত্যসেবীদের লেখনীমুখেই সর্বপ্রথম শুধু দেশপ্রেম নয়, দেশ-উদ্ধারের সংকল্পটা পর্যন্ত ফুটে উঠেছিল। বিবেকানন্দ অবশ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, তবে তাঁর উদ্দীপনাময়ী কয়েকটি রচনা ও বক্তৃতা এই বিষয়ে কম সহায়ক হয় নি। বাঘা যতীনের পকেটে তো সব সময় বিবেকানন্দের বই আর গীতা থাকত এবং ঐগুলি তিনি ছেলেদের মধ্যে বিতরণ

করতেন। শুধু বিতরণ করা নয়, ঐগুলি তিনি তাদের ভালো করে পড়তে বলতেন। বলতেন, "দেশের কাজ করবি তো আগে শ্রীকৃষ্ণের ক্লৈব্য-বিদূরক বাণী আর স্বামীজির বাণী হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নে।"

বিপিনচন্দ্র বলতেন, আগে ভাব, পরে কাজ।

ভাবটাই মুখ্য, কাজটা গৌণ।

তাই দেখা যায় যে প্রাক্-স্বদেশী যুগের অনেক আগে থেকেই ভাবের প্রক্রিয়াটা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ভালোরকমেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং যখন কাল প্রসন্ন হোল তখন সেই পুঞ্জীভূত ভাবরাশি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাস্তবরূপ নিয়ে বাঙালীর সামনে ফুটে উঠল। ভাব থেকে বাস্তবের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা তার পিছনে শুধু একজনের প্রতিভা সক্রিয় ছিল বললে অন্যায় হবে, একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রয়াস সেই প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলেছিল। কণ্বমুনির আশ্রমে অনসূয়া বা প্রিয়ংবদাকে বাদ দিয়ে একা শকুন্তলার চিত্র যেমন অসম্পূর্ণ, লঙ্কাযুদ্ধে লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীবকে বাদ দিয়ে রামচন্দ্রের চিত্র যেমন অসম্পূর্ণ, মাওয়ালি সহচরদের বাদ দিয়ে শিবাজীর চিত্র যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারে মিত্তির সাহেব, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সরলা দেবী ও নিবেদিতাকে বাদ দিয়ে অরবিন্দের ভূমিকা অসম্পূর্ণ। কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই একক চেষ্টায় সংঘটিত হয় না। একা নেপোলিয়নের পক্ষে ফরাসীদেশে বিপ্লব নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না, যেমন সম্ভব ছিল না একা লেনিনের পক্ষে রুশ বিপ্লবের আয়োজন করা। তেমনি একা অরবিন্দের পক্ষেও বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের কাজটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। ক্রোচে তাই বলেছেন: "জাতির মুক্তি প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা পৃথিবীর কোন দেশে যখনি ঘটতে দেখা যায়, বিশ্লেষণ করলে পরে দেখা যাবে যে, ঐ জাতীয় ঘটনা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রয়াস ভিন্ন আদৌ সম্ভব হতে পারত না।" তথাপি বিংশ শতকের সূচনায় অরবিন্দকে আমরা

'মহত্তর আবির্ভাব' বলি এই কারণে যে, সেদিন তিনিই ছিলেন বিপ্লববাদের প্রধান প্রবক্তা ও বিপ্লব-দর্শনের প্রধান উদ্গাতা। পর-শাসনমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে জাতিকে সর্বাগ্রে "রক্ত ও অগ্নিস্নানে পবিত্র হইতে হইবে"—এই কথা তাঁর আগে আর কোন দেশনেতার কণ্ঠে শোনা যায় নি। এই 'Blood and fire'-এর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বাঘা যতীন। সেইজন্য তাঁকে আমরা অরবিন্দের বৈপ্লবিক চেতনার যোগ্য উত্তরসাধক বলতে পারি।

অরবিন্দের কথা আরো একটু আলোচনা করা দরকার।

আমরা জানি বাঘা যতীনের বিপ্লবী-জীবনের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল দুইজনের—অরবিন্দ ও নিবেদিতা। আর এই দু'জনেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি। বরোদার রাজ-কলেজের হাজার টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র বেতনে যখন অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন, তখন কে জানত যে শান্তশিষ্ট ও স্বল্পভাষী এই মানুষটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি অগ্নেয়গিরি। য়ুরোপের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত ছিলেন তিনি—দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল অতিবাহিত করেছেন সেই দেশে শৈশব-কাল থেকে, তথাপি তিনি নকল সাহেব সাজেন নি। কিংবা আচারে-আচরণে কিছুমাত্র য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন নি। এটাই বোধ হয় ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রেত ছিল যে, যাঁকে দিয়ে দেশে একটি বিরাট জাগরণ আসবে তাঁকে মনেপ্রাণে খাঁটি ভারতীয় থাকতে হবে।

বাংলাদেশে এসে তিনি একদিকে করতে থাকেন গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজ, অন্যদিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলগঠন ও জাতীয় আদর্শ প্রচারের কাজ। বিংশ শতকের দুনিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে তিনি যে সত্যিই একটি 'মহত্তর আবির্ভাব' ছিলেন সেটি বুঝতে হলে সকলের আগে বুঝতে হয় তাঁর প্রচারিত জাতীয়তার আদর্শ। স্বদেশী আন্দোলন তো বাংলায় তাঁর আসবার আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত যেন কি একটা জিনিসের অভাব ছিল তার মধ্যে।

জাতীয় আন্দোলনকে তিনি চাইলেন অধ্যাত্মসাধনার মর্যাদা দিতে। দেশহিতৈষণাকে তিনি দিলেন ইষ্টনিষ্ঠার গুরুত্ব। তাঁর কাছে ঈশ্বর তাঁর দেশ। ভারতবর্ষকে তিনি দেখতেন একটি ঔপনিবেশিক ভূখণ্ড মাত্র হিসাবে নয়, সাক্ষাৎ জগন্মাতা হিসাবে। অরবিন্দের দেশসেবার এই আদর্শটা সেদিন যদি আমাদের সামনে না থাকত তাহলে বিপ্লববাদ বাংলার মাটিতে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। তাঁর বিপ্লব-দর্শনই অজগরের নিঃশ্বাসের মত সেদিন আকর্ষণ করেছিল বাঘা যতীনকে ও আরো অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীদের। তাই তো তাঁরা অমনভাবে পূর্ণাহুতি দিতে পেরেছিলেন সেই বিপ্লব-যজ্ঞে।

অরবিন্দ বললেন, "যাহারা বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিবে তাহারা যেন উপলব্ধি করে যে দেবতার হাতে তাহারা যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশসেবাকে গ্রহণ করিতে হইবে জীবন-ধর্ম হিসাবে। এই ব্রত হইবে আত্মনিবেদন আর আনুগত্যের সাধনা—এই কর্মযোগ বিনা দ্বিধায় দুঃখবরণের ব্রত।" মৃত্যুর আগে বিবেকানন্দও জাতিকে এই কর্মযোগে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। বাঘা যতীনের জীবনেও আমরা দেখি যে, যৌবনের প্রথমেই যখন তিনি ভোলানন্দ-গিরির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন সেই সন্ন্যাসীও তাঁর শিষ্যের কর্ণে সেই একই মন্ত্র দিয়ে থাকবেন। তিনি যে অরবিন্দ এবং নিবেদিতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তার রহস্যটা তো এইখানেই। এই তরুণ বিপ্লবীর প্রাণের একতারায় সকলের অগোচরে কর্মযোগের যে অবিরাম ঝঙ্কার উঠত, এই দুইজনের সান্নিধ্যে এসে বাঘা যতীন কি অনুভব করেন নি যে সেই একই সুর, একই রাগিনী ঝঙ্কৃত হয়ে চলেছে এই দুইটি মহাবিপ্লবীর জীবন-বীণার তারে।

এইবার নিবেদিতার কথা।

বাংলায় বিপ্লববাদের সংগঠন কার্যে গোড়া থেকেই সক্রিয়

ভূমিকা নিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁকে বাদ দিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ। এখানে তাই তাঁর প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। বাঘা যতীন স্বয়ং এই বিপ্লবী-নায়িকার একান্ত স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। বাগবাজারে তাঁর সেই বোসপাড়া লেনের 'ভগিনী-নিবাস' নামক স্কুলবাড়িতে তখনকার যেসব বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল, বাঘা যতীন ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। "যতীন ইজ এ স্পার্ক" অর্থাৎ, "যতীন একটি স্ফুলিঙ্গ বিশেষ"—তাঁর সম্পর্কে নিবেদিতার এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। এরই মধ্যে যেন সুন্দর ভাবে আভাসিত হয়েছে বাঘা যতীনের বিপ্লবী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। ১৯০২ থেকে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত যে ইতিহাস, তার মধ্যে একটি বিশেষ অধ্যায় হলো বাংলার অগ্নিযুগ। এই অগ্নিযুগের কথা পরবর্তী কালে অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের কেউ-ই নিবেদিতার নাম ঠিক সেইভাবে উল্লেখ করেন নি, যেভাবে করা উচিত ছিল। এর ব্যতিক্রম শুধু একজন; তিনি স্বনামধন্য লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী। একমাত্র তিনিই বাংলায় বিপ্লব-প্রয়াসের আদিপর্বে এই মহীয়সী মহিলার দানের কথা তাঁর বিখ্যাত 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে, সম্পূর্ণ-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙালী মাত্রই এজন্য এই মনীষির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর কিছু পরেই আমরা দেখতে পাই যে, নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেইখানেই তিনি অরবিন্দকে বলেছিলেন, আমার মন বলছে, বাংলায় শীঘ্রই বিপ্লব দেখা দেবে। এখন দরকার একজন নেতার। আপনাকে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। অরবিন্দ রাজী হন। এই সাক্ষাৎকারের তিন বছর পরেই বাংলাদেশে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতা ও অরবিন্দ দু'জনেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দু'জনেরই ভূমিকা

ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা ছিলেন বিপ্লবের শিক্ষাগুরু, অরবিন্দ দীক্ষাগুরু। বাংলা দেশে কলিকাতায় যে গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হয় তার পাঠাগারে নিবেদিতা অনেকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তক দান করেন, সেইগুলি ছিল বিপ্লবমূলক সাহিত্য। ঐ জাতীয় দুর্লভ সাহিত্য সেদিন একমাত্র নিবেদিতার সংগ্রহশালায় ছিল, আর কারো কাছে ছিল না। "তিনি দিলেন তাঁর বিপ্লববাদের পুস্তক-সংগ্রহ। তাঁর বইগুলির মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইতালির মুক্তিদাতা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী।" শুধু কি এই জাতীয় বই? অর্থনীতির কিছু কিছু ভাল বইও তিনি দিয়েছিলেন। রাজনীতি বা বিপ্লব করতে হলে অর্থনীতি সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার, নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা সেদিন এই উপদেশ পেয়েছিলাম। "দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থাটা সবচেয়ে আগে ভালো করে আমাদের জানা দরকার, মিঃ ব্যানার্জি।" —একথা বলেছিলেন নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রমেশচন্দ্র দত্ত যাঁর 'ধর্মপিতা' তাঁর 'ধর্মকন্যা'র উপযুক্ত কথাই বটে।

বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িটি সেদিন তরুণ বিপ্লবীদের একটা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবাত্মক সাহিত্যের পাঠ তাঁরা তাঁর কাছেই গ্রহণ করতেন। এদের কানে সব সময়ে তিনি বিবেকানন্দের সেই অগ্নিবাণী শোনাতেন। "তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে একমাত্র উপাস্য দেবতা তোমার এই জননী জন্মভূমি।" নিবেদিতা যে এইসব বই দান করেছিলেন তার সংবাদ দীর্ঘকাল গোপন ছিল। কলিকাতায় প্রধান কেন্দ্র থেকে সেই সব বই সারা দেশের মধ্যে ঘুরত। এর ফলে ভাবীকালের বিপ্লবী কর্মীদের মানসিক গঠনের প্রক্রিয়াটা ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন: "পরবর্তীকালে আলিপুর বোমার মামলার

সময়ে পুলিশ নিবেদিতার দেওয়া এইসব নিষিদ্ধ পুস্তক বাংলার নানা স্থান থেকে খানাতল্লাসী করে উদ্ধার করেছিল। নিবেদিতা বলতেন, একে একে আমার প্রিয়গুলি আত্মপ্রকাশ করছে।" কথিত আছে, বাঘা যতীনের কাছে নিবেদিতার দেওয়া ম্যাট্‌সিনির আত্ম-চরিতের প্রথম খণ্ড ছিল। এই বইখানি তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন ও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মিদের পড়িয়েছিলেন। বলতেন—গেরিলা যুদ্ধ যদি শিখতে চাস্ তবে ম্যাট্‌সিনির আত্মচরিত-খানা ভাল করে পড়বি।"

যে অগ্নিশিখাটিকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন, সেই ভগিনী নিবেদিতার সেদিন, বিপ্লবের সেই ঊষাকালে, বাংলাদেশে উপস্থিতি যে বিশেষভাবেই সহায়ক হয়েছিল তা দিবালোকের মতোই সত্য।

বিবেকানন্দ যখন সিংহিনীসমা এই বিদেশিনীকে তাঁর শিষ্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। আইরিশ বিপ্লবের কোলে যাঁর জন্ম, বৈপ্লবিক ভাবধারার মধ্যে যিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন, সেই নিবেদিতা যে তাঁর অবর্তমানে বাংলাদেশের বিপ্লব-সাধনার ক্ষেত্রে এমনভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন ও মায়ের মতো বাংলার নাগশিশুদের তিনি রক্ষা করবেন, এ কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? হয় ত পেরেছিলন। বাংলাদেশে অচিরেই যে বিপ্লবের অভ্যুত্থান হবে—এমন ইঙ্গিত স্বামীজি তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে দিয়েছেলেন, এ-কথা ভগিনী নিবেদিতার অপ্রকাশিত ডায়েরিতে লেখা আছে। তাই দেখা গেল যে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে এবং বিপ্লব-তুরঙ্গমের পদধ্বনিতে চারদিকের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর গুরুর অভিপ্রায় তিনি বুঝেছিলেন বলেই নিবেদিতা তাঁর সাত নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বিপ্লবের একটি অগ্নিচক্র গড়ে তুলেছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে,

শুরু থেকেই সেই প্রজ্জ্বলিত পরিবেশে নিবেদিতাকে আমরা দেখতে পাই একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। সে বিপ্লবতরঙ্গে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—তাঁর যৌবনের অগ্নি চরিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চরণে যেন বেজে উঠেছিল ঝঞ্ঝার মঞ্জীর। তাঁর ললাট থেকে সেদিন সত্যিই বিচ্ছুরিত হয়েছিল বিধাতার রুদ্ররোষ। সন্ন্যাসিনী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রুদ্রাণীরূপে; তাপসী হয়েছিলেন সিংহবাহিনী রণচণ্ডী। তাই বলছিলাম, বাংলার স্বদেশীযুগ ও বিপ্লব যুগের আদিপর্বের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নেপথ্য থেকে যে মনোবল তিনি নেতা ও কর্মীদের মনের মধ্যে জাগিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ ইতিহাস বোধ হয় আজো লেখা হয়নি।

অরবিন্দ আসার পর থেকেই বাংলা দেশে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

তাঁর আগমনে বাংলায় যেন নব প্রাণের সঞ্চার হোল।
ইতিহাসের বুকে ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলল।
সে যেন এক উত্তাল যৌবন জল-তরঙ্গ।

এই আগ্নেয় পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল কনফারেন্স—স্বদেশী আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এ ঘটনা ১৯০৬ এর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঘটেছিল। এই স্মরণীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন বরিশাল তথা বাংলার এক বিরাট পুরুষ—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশালে সেদিন তাঁরই শাসন চলত, ইংরেজের নয়। নিবেদিতা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না, অরবিন্দ ছিলেন। বাংলার বিপ্লব অন্দোলনের উপরে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। মনীষি গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন: "বরিশালে বিপ্লবী অরবিন্দ ফুলারী দমননীতির চরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলেন। বাঙালী সেদিন রক্তদান করিয়া রাজাদেশ অমান্য করিল, নিষ্ক্রিয় প্রাতরোধের জীবন্ত

দৃষ্টান্ত দেখাইল—বিপ্লবী অরবিন্দ তাহা দেখিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুখ নীরব ছিল, মন নীরব ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের কথা, আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের কথা একে একে তাঁহার সত্ত-উত্তেজিত মনের উপর দিয়া চলচ্চিত্রের ছবির মত ছায়াপাত করিয়া গেল। আর তাঁহার বিপ্লবী মন যে স্তব্ধ হইয়া কি সংকল্প করিল, তাহা কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সর্বপ্রথমে নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।”

বরিশালের অভাবনীয় দমননীতি ও রক্তপাত থেকেই যে বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়চেতনা বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যখন আমরা সেই দিনকার ইতিহাস স্মরণ করি তখন দেখতে পাই, বাংলার দু'কূল প্লাবিত করে বিপ্লবের ভাবগঙ্গা বয়ে চলেছিল। সেই উদ্দাম শ্রোতোধারাকে সেদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দু'জন—অরবিন্দ ও নিবেদিতা। এর পরেই ফুলার-বধের আয়োজন চলে যুগান্তরের আড্ডায়। বাংলায় এই প্রথম বৈপ্লবিক কর্মের—ফুলার-বধের ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়িকা সেদিন ছিলেন নিবেদিতা। তৎকালীন বিপ্লবীদলের বাংলা মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক, বিবেকান্দের সহোদর, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন: “অরবিন্দ ও নিবেদিতার একত্র মিলিত পরামর্শ অনুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের সূত্রপাত হয়েছিল।”

তখন থেকেই পুলিশের দৃষ্টি পড়ে নিবেদিতার উপরে।

গুপ্তচর ঘুরে বেড়াতে থাকে সাত নম্বর বোসপাড়া লেনের সেই বাড়িতে। কিন্তু তিনি ভয়লেশহীন চিত্তে লেলিহান শিখার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করতে থাকেন। তাঁর ললাটনেত্রের প্রদীপ্ত আগুনে ইতিহাসের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে আর বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠতে থাকে বিপ্লবের রণদুন্দুভি। সেই প্রলয়োল্লাসের দিনে নিবেদিতাকে দেখা গিয়েছিল নাগমাতারূপে। উদ্ধত রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে হেলায় উপেক্ষা করে তিনি সেদিন বাংলার

নাগশিশুদের কানে শুনিয়েছিলেন শক্তিমন্ত্র, তাঁর পক্ষপুটে দিয়েছিলেন তাঁদের অনেককে নিরাপদ আশ্রয়। মোটকথা, বরোদা থেকে বাংলায় এসে অরবিন্দ দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সকল শক্তি নিয়ে তাতে শুধু যোগদান করা নয়, সেই বিপ্লব-তরঙ্গে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

১৯০৮, ৩রা মে তারিখের সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখেছিলেন : The ideal creates the means of attaining the ideal, if it is itself true and rooted in the destiny of the race." অর্থাৎ "আদর্শই আদর্শলাভের উপায় উদ্ভাবন করে, যদি সেই আদর্শ হয় যথার্থ আর তার মূল নিহিত থাকে জাতির নিয়তি-নির্দিষ্ট বিধানের মধ্যে।" বাঘা যতীনের বিপ্লবী জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করলে আমরা এই উক্তিটির মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এখন প্রশ্ন এই যে, এই আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝব এবং বাংলার বিপ্লববাদের আদিপর্বে এর স্থান কোথায়? লেনিন বলেছেন, বিপ্লবকে সৃষ্টি করতে হয় না—বিপ্লব আপনি আসে। জার-শাসিত রাশিয়ার পক্ষে হয়ত এটা সত্য হতে পারে, কারণ সেই দেশে আদর্শের কোন বালাই ছিল না। ফরাসী দেশে যে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, দেখা যায় তার পিছনে একটি আদর্শ সক্রিয় ছিল। রুশো-ভলতেয়ারের অগ্নিবর্ষী রচনার ভিতর দিয়ে ফরাসীজাতি সেই আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল।

বাংলা দেশে এই আদর্শটা প্রথমে দিয়েছিলেন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ এবং পরে অরবিন্দ। বঙ্কিমের আদর্শটা ছিল কিছু পরিমাণে রোমান্টিক, বিবেকানন্দের আদর্শ মূলত আবেগ ও উচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত আর অরবিন্দের আদর্শটা ছিল একেবারে স্ফটিক-স্বচ্ছ, কঠিন বাস্তবতায় ভাস্বর। এর প্রমাণ তাঁর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি : "জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইতে হইবে।" বাঘা যতীনের বিপ্লবী-মানস বিশ্লেষণ করলে পরে আমরা তাঁর মধ্যে যুগপৎ এই তিন প্রকার আদর্শেরই সন্ধান পাই। একাধারে তিনি ছিলেন রোমান্টিক, ভাবপ্রবণ ও প্র্যাকটিক্যাল। এবং এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশেই

তাঁর স্বল্পকাল-স্থায়ী নেতৃত্ব ফুটে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র মহিমা নিয়ে যা তাঁর অন্য কোন সহকর্মীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। উত্তরকালে একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও তাঁর কর্ম-প্রয়াসের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল।

বাঘা যতীন যে মানসিক শক্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার পিছনে ছিল একটা বড় রকমের আদর্শ। যে উৎসাহ, আশা ও ভরসা নিয়ে তিনি সংসার-সুখ তুচ্ছ করে, সরকারী ভাল চাকরির মায়া কাটিয়ে কণ্টকময় এই বন্ধুর পথের অগ্রচারী পথিক হতে চেয়েছিলেন তার উৎস একটা মহৎ আদর্শ ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। বিপিনচন্দ্র পাল তাই বলতেন, সকল মহৎ কাজের পিছনে একটা আদর্শ থাকা চাই। বাঘা যতীনের জীবনে আমরা তাই দেখতে পাই যে, নবীন তারুণ্যের প্রত্যূষ কাল থেকেই তিনি স্বাধীনতার স্বপ্নে আত্মহারা হতেন। এই স্বপ্ন আদর্শেরই নামান্তর মাত্র ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে এই আদর্শ পরিণত হয় দুর্জয় সংকল্পে। তিনি সেই সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে প্রমথনাথ ও অরবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত-সমিতিতে যোগদান করে দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা কল্পে ধর্মসাক্ষী পূর্বক যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন।

বিপ্লবীর চরিত্রকে বুঝতে হবে বিপ্লবী জীবনের আদর্শ এবং আদর্শ-নিষ্ঠা দিয়ে এবং সেই জীবনের অন্তর্নিহিত ভাব দিয়ে। এই আদর্শ ও ভাব তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে যখন ফুটে উঠল, তখন থেকেই তাঁর প্রকৃত বিপ্লবী জীবনের আরম্ভ। আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই যতীন্দ্রনাথ খুব সক্রিয় হয়ে উঠলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই সক্রিয়তা প্রথম দেখা গেল নন্দলাল-নিধন কাজের মধ্যে। "বাঙালী দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফুল্ল চাকীকে মোকামা স্টেশনে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। নন্দলাল প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলে প্রফুল্ল বলেছিল, আপনি

বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন ?....প্রফুল্লর সে অভিমান-পূর্ণ ব্যর্থ অন্তিম আবেদন যতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে শেলের মত বিঁধেছিল। তিনি আদেশ দিলেন দারোগা নন্দলালকে খতম কর। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে নন্দলাল কলকাতায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময়ে তাঁর বাড়ির নিকটে গলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের এক বিপ্লবী শিষ্য নন্দলালের বুকে গুলি করে তাকে শেষ করলেন।"

দ্বিতীয় ঘটনা আশুতোষ-নিধন।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকারী উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। সরকার পক্ষের কৌঁসুলি নর্টন সাহেব আর কোর্ট উকিল আশুতোষ বিশ্বাস—এঁরা দু'জনেই এই মামলায় সরকার পক্ষের বিশেষ ভরসা ছিলেন। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে তোলার ব্যাপারে এই সরকারী উকিলটি বিশেষ তৎপর ছিলেন। শুধু তাই নয়। কথিত আছে, এই মামলা চলবার কালে প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে প্রথম যে কৌঁসুলি দাঁড়িয়েছিলেন, সেই স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে একদিন আদালতে আশু বিশ্বাস দম্ভভরে বলেছিলেন—"I will finish terrorism". অর্থাৎ, বাংলাদেশ থেকে আমি সন্ত্রাসাবাদের উচ্ছেদসাধন করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই মামলা পরিচালনার জন্য সেদিন যে 'ডিফেন্স ফাণ্ড' গঠিত হয়েছিল, তাতে প্রথম দফায় যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল, সেই অর্থ দিয়ে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে প্রথমে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর অন্যতম জামাতা, ব্যারিস্টার বসন্তকুমার লাহিড়ীর কাছে লেখক শুনেছেন যে, চক্রবর্তী সাহেব যে Line of argument অর্থাৎ সওয়ালের যে ছক করে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরে চিত্তরঞ্জন সেই পথেই তাঁর মামলা পরিচালনা করে জয়যুক্ত হন। বাংলার বাইরে অন্য একটি আদালতে অন্য একটি মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। দুঃখের

বিষয়, এই তথ্যটি অরবিন্দ বা চিত্তরঞ্জনের কোন জীবনীকার, বা বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসের কোন লেখকই আজ পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন এই সরকারী উকিলটি তাঁদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ঠিক হোল আশু বিশ্বাসকেও খতম করতে হবে। তাঁর যে কথা সেই কাজ। "যতীন্দ্রনাথ এঁকে শেষ করবার জন্য পাঠালেন তাঁর নির্ভীক বিপ্লবী শিষ্য চারু বসুকে। চারু বসু দুপুর বেলায় আদালতে আশু বিশ্বাসকে গুলি করেন। আশু বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। চারু গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিচারের জন্য যখন দায়রা আদালতে মামলা আরম্ভ হোল, তখন চারু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, 'বিচার-ফিচারের দরকার নেই বাবা, এখুনি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও। অনর্থক আর দেরি কেন? আমার কাজ ত আমি সেরেই দিয়েছি, এইবার তোমাদের কাজ তোমরা শেষ করো।"

বাঘা যতীনের শিষ্যের উপযুক্ত কথাই বটে।

তৃতীয় ঘটনা সামশুল-নিধন। এবং এইটিই ছিল বিখ্যাত ঘটনা।

ইনি ছিলেন তখন কলিকাতা পুলিশের একজন জবরদস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী—ডেপুটি স্নুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ। ইনিও আশু বিশ্বাসের মত বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে প্রবল আক্রোশ পোষণ করতেন। মাণিকতলার বাগান-বাড়িতে খানাতল্লাসী করবার সময়ে এঁর অশিষ্ট ও অভদ্র আচরণের কথা যতীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনা করবার ব্যাপারে সরকার পক্ষে ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা করিৎ-কর্মা ব্যক্তি। "প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন বোমার আসামীদের যেন অনেকগুলিকে ফাঁসিতে লটকাতে পারেন। মিথ্যা প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সৃষ্টি করার কার্যে একেবারে ধুরন্ধর।....বিপ্লববাদী সহকর্মীরা জেলের খাঁচায় বসে যখন তাঁদের কামনা জানাচ্ছেন 'কবে সামশুল চোখে দেখবে সরষে ফুল' তখন যতীন্দ্রনাথ এই গুরুভার তুলে নিলেন তাঁর স্কন্ধে।"

সামশুলের কথা আরো একটু বলা দরকার।

বাঘা যতীনের অন্যতম শিষ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে এম. এন. রায় বা মানবেন্দ্রনাথ রায় এই নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বৈপ্লবিক কার্য অনুষ্ঠানের জন্য বোমা-পিস্তলের প্রয়োজন যখন অনুভূত হয়, তখন ঠিক হয় যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে আর সেই টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র। স্বদেশী ডাকাতির এই হোল সূচনা এবং কলিকাতায় এর প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল চিংড়িপোতা ডাকাতি। এই ঘটনা ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ঘটেছিল। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ চিংড়িপোতা (বর্তমান নাম সুভাষ নগর) রেল-স্টেশনে ডাকাতি করে সরকারী অর্থ লুট করেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "সেদিন সেই ছোট্ট একটি গ্রামের ছোট্ট একটি রেল-স্টেশনে এই যুগান্তকারী ঘটনা সমগ্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা করল; ইহাই প্রথম ও অজানা পথের সুনিশ্চিত সংকেত বলে এর মূল্য অনেক।"

এই ডাকাতির পর নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়েছিলেন। পুলিশ সাড়ম্বরে মামলাও করেছিল। এই মামলা সরকার পক্ষ থেকে পরিচালনা করেন সামশুল আলাম। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পান। বিপ্লবীদের খাতায় সেইদিনই সামশুলের নাম উঠে গিয়েছিল। এর পর কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন নরেন্দ্রনাথ। বছর দুই পরে অর্থাৎ ১৯০৯ সনে নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ডাকাতি ডায়মণ্ড হারবারের কাছে নেত্রাগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এই মামলার তদন্তও করেন সামশুল।

"কিন্তু সামশুলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া বড় শক্ত কাজ। সে বড় ঝানু ঘুঘু। কিছুতেই তাকে পাওয়া যায় না। নন্দলাল বা আশু বিশ্বাসের মত সে সহজ প্রাপ্য নয়। সে সর্বদা অতি সাবধানে লুকিয়ে থাকে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাকে সদা-সর্বদা সতর্ক প্রহরার

কৌটায় পুরে রাখে। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু 'অসম্ভব' কথাটি বিপ্লবীদের অভিধানে লেখা থাকে না। যতীন্দ্রনাথের জীবনে অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো তাঁর কাজ।"

দিন যায়।

আলিপুরে বীচক্রফটের আদালতে দিনের পর দিন চলে মামলার শুনানী। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ সর্বদা সামসুলের গতিবিধির উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। কার উপর এই কঠিন কাজের ভার দেওয়া যায়?

—যতীনদা, আমি কি পারব না?

—তুই! তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ, বীরেন।

—হলেই বা ছেলেমানুষ। একবার দায়িত্বটা দিয়ে দেখুন না, পারি কি না পারি।

এই কথা বলতে বলতে বীরেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যতীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, সে মুখে কঠিন সংকল্পের রেখা ফুটে উঠেছে। অতঃপর তিনি তাকেই এই কঠিন কাজের জন্য নির্বাচন করলেন। এই কিশোরের বয়স ছিল তখন মাত্র উনিশ বছর; নাম—বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। পূর্ববঙ্গের ছেলে, ঢাকায় বাড়ি। সে ছিল যতীন্দ্রনাথের প্রিয়তম শিষ্য। সামসুল হত্যার কঠিন কাজ তাকেই তিনি দিলেন। এই গুরুদায়িত্ব দেবার সময়, কথিত আছে, তিনি বীরেনকে বলেছিলেন: মনে আছে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুর পাঠাবার সময়ে কি বলা হয়েছিল তাদের?

—জানি যতীনদা। হয় কার্যসিদ্ধি, না হয় মৃত্যু।

—সাবাস! তুই লোকটাকে চিনতে পারবি?

—না দাদা, আমি সামসুলকে কখনো দেখিনি, চিনতে পারব না।

—বেশ, তোর সঙ্গে আমি সতীশ সরকারকে দিচ্ছি। সেই

তোকে চিনিয়ে দেবে। নিশানাটা যেন অব্যর্থ হয়। নইলে আর চান্স পাব না।

১৯১০, ২৪শে জানুয়ারি।

দিবা দ্বিপ্রহর। স্থান—কলিকাতা হাইকোর্ট।

যথাসময়ে সতীশ ও বীরেন হাইকোর্টে এলো। লোকজনের আনাগোনায় প্রধান বিচারালয় সরগরম। এখান থেকে পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার বেশী দূর নয়। হাইকোর্টের পশ্চিম দিক দিয়ে বিপ্লবী দু'জন প্রবেশ করে। সেই সময় সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন সামসুল। "বীরেনকে সতীশ সরকার সামসুলকে দেখিয়ে চলে গেল। বীরেন হাইকোর্টের প্রশস্ত বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল। সামশুল যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাচ্ছিলেন তখন বীরেন তাঁর সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সামসুল আলাম?

—হ্যাঁ।

ড্রুম্! ড্রুম্!!

বীরেনের রিভলবার গর্জন করে উঠল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে সামসুলের বুকে গুলি করে। অত কাছে দাঁড়িয়ে গুলি ব্যর্থ হবার নয়। "চক্ষের পলকে সামসুল বারান্দার উপরে লুটিয়ে পড়লেন। চারদিক থেকে রক্ষী প্রহরী চাপ্রাশী আরদালী প্রভৃতি খুন খুন চীৎকার করে ছুটে এল বীরেনকে ধরতে। প্রথমে একজন সশস্ত্র কনেস্টবল ছুটে ধরতে আসে। কিন্তু তখনো বীরেনের রিভলবারে কয়েকটি গুলি অবশিষ্ট ছিল; সেইগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বীরেন বারান্দা দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু শীঘ্রই তার গুলি ফুরিয়ে গেল।"

বীরেন ধৃত হলো।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তার বিচার আরম্ভ হয়। তিনি বীরেনকে দায়রা সোপর্দ করেন। হাইকোর্টে যখন এই মামলার দায়রার বিচার শুরু হয় তখন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্রনাথ ধৃত

হয়েছেন। বীরেন আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি, এবং এজন্য কোন উকিল ব্যারিস্টারও দেয়নি। কিন্তু খুনী আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা মামলা চলে না। সরকার তখন আসামীর পক্ষ সমর্থন করার জন্য ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেনকে নিয়োগ করেন। নিশীথচন্দ্র তখন তরুণ ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জনের সহকারী। তাঁরই নির্দেশে তিনি বীরেনের পক্ষ সমর্থন করতে সম্মত হন। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই বাংলার বহু বিপ্লবী সন্তানের মামলায় অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থেকে চিত্তরঞ্জন যেভাবে এইসব নাগশিশুদের রক্ষা করেছিলেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হয় ১৯০৮ সনে।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মামলার শুনানী চলেছিল প্রায় ছ'বছর। এই মামলার বিচার হয়েছিল আলিপুর আদালতে শ্বেতাঙ্গ জজ বীচক্রফটের এজলাসে; সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইনি মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। তাই কথিত আছে যে, প্রথম দিন আদালতে অরবিন্দকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখে জজ বীচক্রফট রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সৌজন্যবশত আদালতের নিয়ম-বহির্ভূত একটি কাজ করেছিলেন—আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট কাঠগড়ার বাইরে অরবিন্দকে একটি স্বতন্ত্র আসন প্রদান করেছিলেন; একখানি চেয়ারে বসবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। অরবিন্দ বীচক্রফটের এই সৌজন্য প্রকাশে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, তিনিই যখন এই মামলার প্রধান আসামী সাব্যস্ত হয়েছেন তখন আসামীর কাঠগড়ায় অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে থাকাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু এরই মধ্যে আভাসিত হয়েছে অরবিন্দের বিপ্লবী-চরিত্রের অসামান্যতা। বীচক্রফটের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

প্রায় ছ'বছর শুনানী চলবার পরে এই মামলা শেষ হয়। প্রধান আসামী অরবিন্দ নির্দোষী বলে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু এই দীর্ঘকাল বিচারাধীন আসামী হিসাবে নির্জন কারাবাসে থাকার ফলে তাঁর মনে এক দারুণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। যিনি ছিলেন বিপ্লবের রণগুরু, তিনি এখন রূপান্তরিত হয়ে গেলেন; একটা নূতন চেতনা আচ্ছন্ন করল তাঁর বিপ্লবী সত্তাকে। সমস্ত রকম রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর সতীর্থগণের কাছে এটা ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। জেল থেকে বেরিয়ে

অরবিন্দ দেখলেন যে, দেশের রাজনৈতিক তথা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যেন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—সমস্ত দৃশ্যপটটাই যেন পাল্টে গেছে। লোকমান্য টিলক নির্বাসিত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন সুদূর ব্রহ্মদেশে, বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেল থেকে (ইনি আলিপুর বোমার মামলার কিছু আগে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে আনীত একটি মামলায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন; এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন না করে এদেশে রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিপিনচন্দ্র একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।) মুক্তিলাভ করে সোজা বিলেত চলে গিয়েছেন, সেই দেশে ভারতের রাজনৈতিক দাবী প্রচার করার উদ্দেশ্যে; দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের অধিকাংশই তখন রেগুলেশন আইনে আবদ্ধ হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন।

এইসব ঘটনার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন স্তিমিত হয়ে এসেছিল, তেমনি এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। আগেই বলেছি, বিপ্লবীরা ১৯০৫ বা ১৯০৬ সন থেকেই চারদিকে বৈপ্লবিক কাজকর্ম আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং বাঘা যতীন তখন থেকেই এই বিপ্লব-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তারপর ১৯০৮ থেকে অর্থাৎ আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই তিনি খুব সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিপ্লবী নেতৃ-জীবনের আরম্ভ তখন থেকেই এবং পরবর্তী ছয়-সাত বৎসর কাল অর্থাৎ ১৯১৫ সনে বালেশ্বর যুদ্ধে আত্মদানের সময় পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাংলার বিপ্লব-রথের অবিসম্বাদী সারথি—একথা স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বীকার করেছেন। ১৯১০ সনে কারামুক্তির পর দেখা যায় যে, অরবিন্দ কয়েকটি স্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতা করেন; তাঁর এই সময়কার প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে উত্তরপাড়া বক্তৃতাটি সমধিক প্রসিদ্ধ। যদিও তাঁর এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে জাতীয়তার সুর ছিল, কিন্তু বিপ্লবের ঝাঁজ ছিল না।

তারপর অরবিন্দ নূতন উদ্যমে দু'খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন, বাংলায় 'ধর্ম', ইংরেজিতে 'কর্মযোগিন্'। 'বন্দেমাতরম্' থেকে এই দু'টি কাগজের সুর ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। কোথায় সেই অগ্নিবর্ষী 'বন্দেমাতরম্' আর কোথায় আধ্যাত্মিক বাষ্প-ভরা 'ধর্ম' আর 'কর্মযোগিন্'। এর কিছুকাল পরেই অর্থাৎ, সামসুল আলমের হত্যা ও বাঘা যতীনের গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই দেখা গেল যে, তিনি আধ্যাত্মিক পথের পথিক হয়ে, দিব্যজীবনের সন্ধানে চিরকালের মত দেশত্যাগী হয়ে চলে গেলেন তাঁর নূতন তপস্যার ক্ষেত্র পণ্ডিচেরীতে। পণ্ডিচেরী তখন ভারতে ফরাসী উপনিবেশ কয়টির অন্যতম ছিল। তিনি বাংলা দেশে আর ফেরেন নি, কিম্বা রাজনীতিতে আর প্রত্যাবর্তন করেন নি।

অনেকের বিবেচনায় অরবিন্দের দেশত্যাগটা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে যেন এক প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ—এই তিনজনই ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে আর সেই বাঙালীর সর্বস্ব-পণ করা প্রাণ-জাগান আন্দোলন শেষ হবার আগেই এই তিনজন কার্যক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন। এঁদের মধ্যে আবার বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবের প্রবক্তা। তাই পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে কোন একজন সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন: "ঋষি পলাতক, দার্শনিক উদ্‌ভ্রান্ত আর কবি আশ্রমবাসী।" এঁদের তিনজনেরই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে যতীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তবে অরবিন্দের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে নিবিড় ছিল তা সত্য। তিনি ছিলেন অরবিন্দেরই মন্ত্রশিষ্য ও ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁকেই সামনে আদর্শ হিসাবে স্থাপন করে এই তরুণ গৃহসুখ, জীবনের ভবিষ্যৎ সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে এই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাই অরবিন্দের দেশত্যাগটা তাঁকে যেন বিশেষভাবেই মর্মাহত করেছিল। কথিত আছে, পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার আগে

অরবিন্দ বাংলার বিপ্লবীদের জন্য এই নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন যে, তারা যেন অতঃপর মনে-প্রাণে যতীনের বিপ্লব-প্রয়াসে সহায়তা করে। আরো পাঁচটা বছর যে বাংলাদেশে বিপ্লবের কাজ চলবে, এটা বোধ হয় তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। শোনা যায়, অরবিন্দ চলে যাওয়ার পর একদিন তাঁর এক সহকারীকে যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তোদের নিরাশ হবার কিছু নেই; এখনো যতীন মুখুজ্যে বেঁচে আছে।"

খাঁটি বিপ্লবীর যোগ্য উক্তি এই।

তিনি ছিলেন বলেই না বিপ্লবের অগ্নিস্রোত আরো পাঁচটা বছর অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে পেরেছিল। অরবিন্দের দেশত্যাগের বছরে (১৯১০) পি. মিত্রের মৃত্যু ও তার এক বছর পরে নিবেদিতার মৃত্যু—এইদু'টি ঘটনা বাঘা যতীনকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। কারণ, তাঁর বিপ্লবী-জীবনে এই দু'জনেই—প্রমথনাথ ও নিবেদিতা—যে প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর বিপ্লব-মানস গঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। নিবেদিতার মৃত্যুর সময়ে যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে বিচারাধীন আসামী হিসাবে জেলের মধ্যে আটক ছিলেন। জেলের মধ্যেই তিনি নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে তপ্ত অশ্রু বিসর্জন করেন। আমাদের কাহিনীর সম্পূর্ণতার জন্য প্রসঙ্গত স্বদেশী আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের কথা এখানে কিছু উল্লেখ করা দরকার। বাংলাদেশকে দ্বি-খণ্ডিত করে লর্ড কার্জন ইতিমধ্যে বিদায় নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন এবং আন্দোলনও চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে জনসাধারণের চিত্তে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্রতর করে তুলেছে। বৈধ ও অবৈধ অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র দু'রকম আন্দোলনই চলেছিল পাশাপাশি।

লর্ড কার্জনের পর নূতন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড মিণ্টো। বাংলা তথা ভারতের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করবার জন্য এবং ভারতবাসীকে

সন্তুষ্ট করবার জন্য এই সময় (১৯০৯) একদফা শাসন-সংস্কার ঘোষিত হয়। ইতিহাসে ইহাই মর্লি-মিন্টো রিফর্ম নামে পরিচিত। লর্ড মর্লি ছিলেন তখন ভারতসচিব। এই শাসন-সংস্কার যখন ঘোষিত হয় তখন জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নেতা হিসাবে অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, এই শাসন-সংস্কার ভূয়া—ইহা ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য। শেষ পর্যন্ত মর্লি-মিন্টো সংস্কার-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯১১। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট। তিনি ভারতে বড়লাট হয়ে আসার পর এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা বাতিল করবার জন্য বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ গৃহীত হলো। তারপর ঐ বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিচ্ছেদ বাতিল করে একটি ঘোষণা প্রদান করেন। এই ভাবেই সেদিন বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ একটি অধ্যায়ের শেষ হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিজীবি ও প্রখর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙবার জন্য ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই সময়েই। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আবার সংযুক্ত হলো বটে কিন্তু রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা অনেক পরিমাণেই ক্ষুন্ন হয়ে গেল।

সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯১২-'১৩ সন থেকেই বাংলাদেশে বিপ্লববাদীদের কর্মপ্রচেষ্টা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। সে কর্মপ্রয়াস যেমন দুঃসাহসিক তেমনি ভয়ঙ্কর ছিল। সরকার আশা করেছিলেন যে, আলিপুর বোমার মামলায় যাঁরা ধৃত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই, যথা বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন বিপ্লবের মস্তিক স্বরূপ। সেইসব মাথা যখন সুদূর আন্দামানে প্রেরিত হলো, তখন বাংলায় বিপ্লববাদ

আর নিশ্চয়ই মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু সরকারের এই অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন একজন। তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি নিশ্চেষ্ট বসে থাকবার মানুষ ছিলেন না। আলিপুর বোমার মামলার সময় থেকেই তিনি সরকারের অজ্ঞাতসারে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে বহু বিপ্লবী অনুচর তৈরি করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর হাতে-গড়া শিষ্য বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালের এম. এন. রায়), শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, অবনী মুখার্জি, হুগলীর ভূপতি মজুমদার, খুলনার কিরণ মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যশোহরের বিজয় রায়, নদীয়ার জ্যোতিষ পাল, ক্ষিতীশ সান্যাল, পাবনার আশু লাহিড়ী, বগুড়ার যতীন রায়, রাজসাহীর ধীরেন ঘটক, মাদারীপুরের চিত্তপ্রিয় রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবনের পরপারে চলে গিয়েছেন, জীবিত আছেন মাত্র কয়েকজন এবং তাঁদের কাছ থেকে বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য জীবন-কথার কিছু বিবরণ জানবার সুযোগ লেখকের হয়েছে। একবার মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বালেশ্বর যুদ্ধের নায়ক সম্পর্কে আপনার কী অভিমত। উত্তরে রায় বলেছিলেন: "যতীনদা আমার বিপ্লব-জীবনের গুরু—১৯১৪ সনের প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের তিনিই ছিলেন সর্বাধিনায়ক।"

বাঘা যতীনের জীবন-কথার প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িক আরো দু'জন স্বনামধন্য বিপ্লবীর নামের উল্লেখ করতে হয়। এঁদের মধ্যে একজন হলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩), আর অপরজন রাসবিহারী বসু (১৮৮৬)। এঁরা দু'জনেই যতীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু সংগঠন-প্রতিভা ও আত্মত্যাগে দু'জনেই ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের নামের স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। সাভারকর ছিলেন মহারাষ্ট্রে গুপ্তসমিতি আন্দোলনের সংগঠক আর

বাংলার বাইরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিপ্লবের সংগঠক ছিলেন রাসবিহারী বসু এবং বাংলার বাইরে তরুণ বিপ্লবীদের তিনিই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। এঁরা দু'জনেই ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির মহাত্রাস। যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এঁরা দু'জনেই অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বয়সে ছোট হলেও সাভারকর সম্পর্কে বাঘা যতীন বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন বলে জানা যায়, এবং তাঁর সহকর্মীদের বলতেন: "এত বড় কৌশলী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর দুঃসাহসী বিপ্লবী ভারতে অল্পই জন্মেছেন।" এই দুই বিপ্লবী বীরের জীবনকথা আমি অন্যত্র সবিস্তার আলোচনা করেছি। *

আলিপুর বোমার মামলা অথবা অরবিন্দের দেশত্যাগের ফলে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। বিপ্লব-প্রয়াস তখন থেকেই সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। সাভারকরের নির্বাসনের ফলে মহারাষ্ট্রে গুপ্ত-সমিতির কাজ অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে এবং পাঞ্জাবেও এই সময়ে গুপ্ত-সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। পঞ্চনদ-বিধৌত এই প্রদেশের অবিসম্বাদী নেতা লালালাজপৎ রায়কে সরকার কর্তৃক যে বছরে নির্বাসিত করা হয় (১৯০৮), তখন থেকেই ঐ প্রদেশে ধীরে ধীরে গুপ্তসমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এখানকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে লালা হরদয়াল, সর্দার অজিত সিং প্রভৃতির নাম স্মর্তব্য। এখানে যে বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল তার নাম 'গদর পার্টি'। এই গদর পার্টির শাখা আমেরিকার অনেক শহরেও প্রসারলাভ করেছিল প্রবাসী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের চেষ্টায়। আবার ঠিক এই সময়েই দেখা যায় যে, একদল ভারতীয় বিপ্লবী (এঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সরোজিনী নাইডুর অন্যতম সহোদর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি)

* লেখক-প্রণীত 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসু' ও 'বীর সাভারকর' দ্রষ্টব্য।

ভারতের বাইরে য়ুরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে গিয়ে বৈপ্লবিক অন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এঁদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা এবং এই ব্যাপারে তাঁরা সফল-কামও হয়েছিলেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই বাঘা যতীন যোগাযোগ-রক্ষা করতেন।

এবার আমাদের মূল কাহিনীর প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

সামসুল আলমের হত্যাকে কেন্দ্র করে গভর্ণমেণ্ট চারদিকে পুলিশের বেড়াজাল ছড়ালেন এবং শীঘ্রই একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করলেন। এরই নাম 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা।' পঞ্চাশজন বিপ্লবীকে এই মামলার সঙ্গে জড়ান হয় ও তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথও ছিলেন। তিনি কেমন করে গ্রেপ্তার হলেন? তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বীরেনকে তিনি জানিয়েছিলেন সাম-সুলকে গুলি করে মারার জন্য, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ফাঁসির আসামী এই বীরেনকে পুলিশ কৌশলে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে বিপ্লবীদলের অনেক গুপ্ত সংবাদ জেনে নেয়। উৎপীড়নে যা সম্ভব হয়নি, তাই সেদিন সম্ভব হয়েছিল জঘন্যতম কৌশলে। পুলিশ "বীরেনের মনে বিপ্লবী দলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তার কাছে কথা আদায়ের চেষ্টা করল এবং তারা এই কৌশল অবলম্বন করে সফলকাম হোল।" তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে না, এমন মিথ্যা আশ্বাসও পুলিশ বীরেনকে দিয়েছিল। এইভাবে সেদিন বীরেনের কাছ থেকেই পুলিশ জানতে পারে যে সামসুল আলমকে হত্যা করার পরিকল্পনা কার ছিল এবং কে বীরেনকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

পুলিশের কৌশলে মতিচ্ছন্ন বীরেন বিপ্লবীদলের মন্ত্রগুপ্তি বিস্মৃত হয়। সে এক জবানবন্দীতে যতীন্দ্রনাথের নাম জজের সামনে করে দেয়। বীরেনের এই আচরণকে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা

বলব না ; বলব, "He was a victim to the police conspiracy".—সে পুলিশি ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়েই এই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ নিজে কখনো বীরেনকে বিশ্বাসঘাতক বলেন নি। শুধু বলতেন, বীরেন ছেলেমানুষ, ভুল করেছে। বাঘা যতীনের নেতৃত্বের এ একটা দিক। এই স্বীকারোক্তির ফলেই যতীন্দ্রনাথ সহ উনপঞ্চাশ জন বিপ্লবী ধরা পড়েন ও তাঁদের সবাইকে হাওড়া জেলে রাখা হয়েছিল। তাঁর ছোট মামা ললিত চট্টোপাধ্যায়ও এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথকেই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীরূপে পুলিশ দাঁড় করাল ; সরকার তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার মামলা আনলেন। কথিত আছে, কলিকাতায় যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন যতীন্দ্রনাথকে প্রথমে লালবাজার পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় ও তাঁর কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। তিনি অবিচলিত চিত্তে সেই নির্যাতনের সামনে মুখ বন্ধ করে নীরব থাকেন।

নির্যাতন যখন ব্যর্থ হলো, তখন পুলিশ তাঁকে নানা রকমের প্রলোভন দেখাতে থাকে। কিন্তু তাতেও তিনি অবিচলিত থাকেন। এমন কি পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব নিজে পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেন, তথাপি তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বার করা যায় না। অতঃপর তাঁকে হাওড়া জেলে নিয়ে আসা হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভোলানাথ গিরি মহারাজের নিকট তিনি যখন মন্ত্র গ্রহণ করেন তখন গুরু তাঁর শিষ্যকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়েছিলেন। এই মালাটি সবসময় তাঁর গলায় থাকত। জেলের নিয়ম আছে যে, কয়েদীদের যখন জেলে নিয়ে আসা হয় তখন তাদের কাপড়-চোপড় সব তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখা হয়। যতীন্দ্রনাথের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটির উপরে হঠাৎ জেলারের দৃষ্টি পড়ল।

—মিঃ মুখার্জি, আপনাকে এই মালা খুলে দিতে হবে।

—এই মালা আমার গুরুপ্রদত্ত, আমি কিছুতেই এটা গলা থেকে খুলতে পারি না। স্থিরকণ্ঠে জানালেন যতীন্দ্রনাথ।

জেলার জিদ ধরলেন—না, খুলতেই হবে, জেল-কোডের নিয়ম তাই।

যতীন্দ্রনাথের সেই একই উত্তর—না, কিছুতেই খুলব না।

—তাহলে আপনার উপর এজন্য বলপ্রয়োগ করতে হবে, এই বলে ইংরেজ জেলার তখন একজন সশস্ত্র সিপাহীকে বন্দীর গলা থেকে মালা ছিঁড়ে ফেলে দেবার জন্য আদেশ করলেন। অমনি সেই পাঠান পুলিশ তাঁর সামনে এগিয়ে আসে। রুদ্রমূর্তিতে গর্জে ওঠেন বন্দী—যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ কেউ আমার পবিত্র মালা স্পর্শ করতে পারবে না। সেই নির্ভীক মূর্তি দেখে সিপাহী পিছিয়ে আসে, জেলার আর জেদ করলেন না।

হাওড়া জেল থেকে পুলিশ নিয়ে আসে যতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সী জেলে; উদ্দেশ্য—বীরেনকে দিয়ে তাঁকে সনাক্ত করাবে, কারণ এই সনাক্তকরণটা হলেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাকা হয়। "জেলখানার মধ্যে বীরেন যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত করল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুরু-শিষ্যের দেখা হোল। যতীন্দ্রনাথ নির্ভীক অকুণ্ঠ প্রসন্নভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন।........এইবার যতীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে বীরেনকে জেরা করবার পালা। কিন্তু পরদিন ভোরবেলাতেই বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল, যতীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে তাকে জেরা করবার সময় পাওয়া গেল না।" ১৯১০-এর ৭ই মার্চ এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। ব্যারিস্টার জে. এন. রায় যতীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের কৌঁসুলি একটি সূত্র পেলেন তাঁর আসামীর স্বপক্ষে। প্রথম দিনেই তিনি Law of Evidence অনুযায়ী একটি প্রশ্ন তুললেন: যেহেতু বীরেনকে জেরা করা হয়নি সেজন্য তার সাক্ষ্যের বা স্বীকারোক্তির কোন মূল্য নেই। আদালত এই যুক্তি মেনে নিল।

"এই আইনের ফাঁকে যতীন্দ্রনাথ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন।" এবং সেই সঙ্গে ধৃত সকল আসামীই মুক্তিলাভ করেন।

অভিযোগ থেকে তিনি অব্যাহতি লাভ করলেন বটে, কিন্তু সরকারী চাকরি তাঁর আর রইল না। তাই জেলখানা থেকে বেরিয়ে তিনি সংসারের জীবিকা অর্জনের কাজে মনোনিবেশ করতে থাকেন। পুলিশের খাতায় তখন তাঁর নাম উঠেছে, তাই সরকারী বা বেসরকারী কোনো অফিসে কাজ পাওয়ার সুযোগ ছিল না। অগত্যা তিনি স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। নিলেন জেলাবোর্ডের ঠিকাদারি। এই কাজ নিয়ে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াতেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল যতীন্দ্রনাথের একটি কৌশল। বাইরে এই ঠিকাদারি কাজের আবরণে তিনি জেলায়-জেলায় আবার গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করতে থাকেন। কিন্তু জেলাবোর্ডের কনট্রাক্টর জে. এন. মুখার্জির উপর পুলিশ তাদের সতর্ক দৃষ্টি সমানভাবেই রেখে চলেছিল —গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করে ফিরত।

ইতিহাসের স্রোত চিরপ্রবহমান।

সেই স্রোতোধারার কোনদিনই বিরতি নেই, বিরাম নেই।

ইতিহাসকে যদি আমরা মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করি, তা'হলে দেখতে পাব যে, মহাসাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গের যেমন দুই রূপ আছে—উদ্দাম ও প্রশান্ত—ইতিহাসের স্রোতোধারার মধ্যেও ঠিক এই দুইটি রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি—উদ্দাম ও প্রশান্ত। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা এর সত্যতা দেখতে পাই। রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বরেণ্য যুগনায়কগণ আমাদের জাতীয় জীবনকে যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের স্থৈর্য দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি দেখা যায় যে, ঐ যুগেই মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ প্রমুখ চিন্তানায়কবৃন্দ সৃষ্টি করেছিলেন জাতির স্তিমিত জীবনে ঝড়ের উদ্দাম, আবেগ। সেই আবেগেরই ধারাকে এই শতকের প্রারম্ভে ভগীরথের মত বাংলাদেশে বহন করে এনেছিলেন সেকালের কয়েক-জন তরুণ বিপ্লবী। জাতির জীবনে এঁরাও সঞ্চার করেছিলেন আশ্চর্য গতিবেগ যার মধ্যে আভাসিত হয়েছিল বৈশাখী ঝড়ের উদ্দাম মাতন, আর অগ্নিবীণার ঝঙ্কার। এক কথায়, যৌবন জলতরঙ্গের উদ্দামতা সৃষ্টি করেছিলেন প্রথমযুগের বিপ্লবীরা। এঁদেরই মধ্যে যিনি নায়করূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নানা দিক দিয়েই স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। তাঁকে দেখলেই মনে হতো, তারুণ্যের আগ্নেয়গিরি নিয়ে একটা মানুষ যেন এখনই ফেটে পড়বে। বাঙালী বহুকাল এমন উদ্দাম যৌবনকে প্রত্যক্ষ করেনি—যে যৌবনের ললাটে স্বহস্তে জয়ের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন

স্বয়ং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে যৌবন সার্থক হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্নেহস্পর্শ আর অরবিন্দের ভাবধারা দ্বারা।

সেই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ এইবার আমরা প্রত্যক্ষ করব। এখানে একটু আগের কথা বলা দরকার। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এইসব হত্যাকাণ্ডে ধৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে, এটা অনুমান করেই যতীন্দ্রনাথ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের উপায় চিন্তা করেন এবং তিনি এই জাতীয় স্বদেশী ডাকাতির পক্ষে স্বীয় অভিমত তাঁর সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করেন। এই ডাকাতির ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) ছিলেন তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। সেই সময়ে বাংলা দেশে এই রকম কয়েকটি দুঃসাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় ও দার্জিলিঙ-এ তাঁর এক শিষ্য, ললিত চক্রবর্তী ধরা পড়েন। এই ললিত চক্রবর্তীই সর্বপ্রথম পুলিশের কাছে যতীন্দ্রনাথ সমেত বত্রিশজন বিপ্লবীর নাম বলে দেন ও তিনি আরো বলেন যে, সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পুলিশ সেই প্রথম তাঁর নাম জানতে পারল এবং তারপর সামসুল হত্যার আসামী বীরেনের স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয় ও অবিলম্বে তাঁকে ও নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আরো জন পঞ্চাশকে গ্রেপ্তার করবার জন্য তৎপর হয়। বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর পুলিশ তাঁকে ১৯১০ সনের ২৭ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। পুলিশ যেদিন তাঁকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে সেদিন তাঁর বাসা থেকে তাঁর রচিত বৈপ্লবিক কর্মসূচী-সংক্রান্ত একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে—সেটির নাম: "The Scheme and Formation of the Vigilance Committee", এবং এই পাণ্ডুলিপি থেকে পুলিশ বাংলায় আসন্ন বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার কথা জানতে পারে। তখন থেকেই পুলিশের মনে

এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যতীন্দ্রনাথ একজন রীতিমত বিপজ্জনক ব্যক্তি! সেই 'বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে' তাঁরা খাঁচায় আবদ্ধ করে যখন ভাবছিলেন যে বীরেনের স্বীকারোক্তির ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে তাঁকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারবেন, তখনই Law of Evidence-এর ফাঁক দিয়ে তিনি হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করে আবার নূতন উদ্যমে তাঁর কাজে লিপ্ত হন। যতীন্দ্রনাথ এই মামলা থেকে মুক্তিলাভ করেন ১৯১১ সনের এপ্রিল মাসে। সরকার যখন এই ব্যাঘ্র-প্রতিম বিপ্লবীকে তাঁদের কব্জার মধ্যে আনতে পারলেন না, তখন তাঁরা দশম জাঠ-সৈন্য বাহিনী ভেঙ্গে দিলেন। ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে এই জাঠ-বাহিনীর মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ইংরেজের বিরুদ্ধে সেইসময় গোপনে যথেষ্ট প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ এইরকম একটি অভিযোগও এনেছিল। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ভারতে বিপ্লব প্রয়াসকে ব্যাপকতর করে তুলবার জন্য বাঘা যতীনের মস্তিষ্ক কিরূপ সক্রিয় ছিল। সরকার তাই নিঃশঙ্ক হওয়ার জন্য এই বাহিনী ভেঙে দিয়েছিলেন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করে যতীন্দ্রনাথকে নূতন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলো। সরকারী চাকরি আর থাকবার কথা নয়। তখন তিনি নদীয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শি-দাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জেলাবোর্ডের ঠিকাদার রূপে তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময়ে তিনি সপরিবারে ঝিনেদাতে বাস করতেন; পরিবার বলতে, তিনি, তাঁর স্ত্রী ইন্দুবালা, দিদি বিনোদবালা, কন্যা আশালতা আর দুই পুত্র—তেজেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গে এখানে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই সরকার বুঝতে পারলেন যে, বাংলা দেশে বিপ্লব আন্দোলন মাটিতে শিকড় নিয়েছে এবং সারা দেশেই বিস্তার লাভ করেছে। তাই দেখা যায় যে, ১৯১০

সন থেকেই সরকার এই বিষয়ে সচেষ্ট হতে থাকেন ও সর্বত্র পুলিশের বেড়াজাল ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়কার আর দুটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা। ঢাকায় পুলিন দাসের অনুশীলন সমিতির উপর পুলিশের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ১৯০৬ সনের শেষভাগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সূত্রপাত এবং দ্রুতগতিতে এর কাজ বিস্তার লাভ করে দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৯০৮ সন থেকেই এই সমিতির কার্যকলাপ সরকারকে বিশেষভাবেই বিচলিত করতে থাকে এবং পুলিন দাসকেই এর মূল কল্পনা করে ১৯১০ সনে ঢাকায় তাঁকে ও সমিতির বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে সরকার শুরু করে দেন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা। সমিতিও সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী ঘোষিত হয়। এই মামলাতে পুলিন দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্যান্য অনেকের কঠোর কারাদণ্ড হয়। এর আগে তিনি একবার ধৃত হয়ে কিছুকাল পাঞ্জাবের একটি জেলে আটক ছিলেন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই একাধিক রাজনৈতিক মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনে তিনি এগিয়ে এসে-ছিলেন। ঢাকার সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল আনন্দ রায়ও এই ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেসন্স কোর্টে বিচারান্তের প্রথম দিনেই চিত্তরঞ্জন যুক্তিপ্রভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে আরোপিত দুইটি ধারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। শুধু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের প্রচেষ্টা হিসাবে যে অভিযোগ ছিল সেই ধারাটি বলবৎ ছিল। বাংলার রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলাটি সেদিন নানা দিক দিয়েই গুরুত্ব লাভ করেছিল।

মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলাটিও এইসময়কার কথা। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন সাহেবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে এই মামলাটির উদ্ভব হয়েছিল এবং তিন জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যথা—যোগজীবন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও সন্তোষ

কুমার দাস। মেদিনীপুর সেসন্স আদালতে এঁদের বিচার হয় ও বিচারে প্রত্যেকের দশবছর করে দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। যথা-সময়ে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকে সেসন্স কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। আপিলের ফলে জেলাজজের রায় নাকচ হয় ও তিন জন আসামীই মুক্তিলাভ করেন।

এই সময়কার অপর একটি বিখ্যাত মামলা হলো নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা—যার প্রধান আসামী ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। এই মালার সম্পুর্ণ বিবরণ লেখকের 'বীর সাভারকর' গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। এইসব বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতবর্ষে এই সময়ে বিপ্লবের যেন পূর্ণযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞে আহুতি প্রদান করতে যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বাঙালী ছিলেন, কি মারাঠী অথবা পাঞ্জাবী ছিলেন, এ প্রশ্ন নিরর্থক। তাঁরা সকলেই ছিলেন খাঁটি বিপ্লবী—সাহসে দুর্জয়, সংকল্পে অটল, সংগঠনে দক্ষ, নৈতিক চরিত্রে বলবান আর স্বার্থত্যাগে অদ্বিতীয়। এঁদের প্রত্যেকের শোণিত-ধারায় একটি জিনিসই প্রবাহিত হোত—জ্বলন্ত দেশপ্রেম আর প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষ। মোটের উপর, ১৯১০ সনটি ছিল ভারতে বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের একটা স্বর্ণযুগ। বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপরে বোমা নিক্ষেপ এই বছরেরই আর একটি উল্লখযোগ্য ঘটনা। বাংলা থেকে পঞ্চনদবিধৌত পাঞ্জাব পর্যন্ত সেদিন বিপ্লবের লেলিহান শিখা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তী পাঁচবৎসর কাল পর্যন্ত এই শিখা নির্বাপিত হয়নি।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। সেটি হলো প্রচ্ছন্ন বৈপ্লবিক প্রয়াস। যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনেতিহাসের সঙ্গে এর বিশেষ সংযোগ আছে। ১৯০৮ সনে তখন স্বদেশী আন্দোলনের ভরা জোয়ার—কলিকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে একটি নূতন সংস্থার আবির্ভাব হয়েছিল। দোকান বললেই ঠিক হয়, এবং সেখানে

বিক্রী হোত শুধু স্বদেশী জিনিস। এই শ্রমজীবী সমবায়ের সঙ্গে বিপ্লবী বাংলার যে মানুষটির নাম জড়িয়ে আছে তিনি হলেন উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁরই মুখে শুনেছি যে, প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ও সেদিন বাংলার যেসব তরুণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। পরে অবশ্য তিনি চরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতা অরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ইনি যেমন উন্নত চরিত্রের মানুষ তেমনি সাহসী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। এইগুণে বাংলার বিপ্লবী সমাজে তাঁর একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

যতীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার লিখেছেন: "অমরেন্দ্রনাথের শ্রমজীবী সমবায় বাহিরে ছিল স্বদেশী ভাণ্ডার, কিন্তু ভিতরে ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের ঘাঁটি। এই দোকানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন বাঘা যতীন, অমরেন্দ্রনাথ, চন্দননগরের বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষ, কলিকাতার বিপিন গাঙ্গুলী ও ২৪ পরগণার নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি।" শ্রমজীবী সমবায় ছিল হ্যারিসন রোডে। এই হোল বিপ্লবের একটি মধুচক্র; অপর তিনটি মধুচক্র ছিল রাজা উডমণ্ট স্ট্রীটে অবস্থিত হ্যারি য়্যাণ্ড কোম্পানী; এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী আর কলেজ স্ট্রীটে, গোলদীঘির ধারে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস নামে একটি ছাপাখানা; এটির স্থাপয়িতা ছিলেন সুরেশ মজুমদার এবং বৌবাজারে কবিরাজ বিজয় রায় খুললেন একটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়। কলিকাতায় এই চারিটি কেন্দ্রেই তখন বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল; পুলিশ বহুদিন পর্যন্ত এইগুলি সন্দেহ করতে সক্ষম হয়নি। কলিকাতার বাইরেও ঐ ধরনের কয়েকটি কেন্দ্র তখন গড়ে উঠেছিল; যেমন চক্রধরপুরে বিজয় চক্রবর্তীর কাপড়ের দোকান, বালেশ্বরে শৈলেশ্বর বসুর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম—এটি

ছিল সাইকেল ও ঘড়ির দোকান। এই ধরনের দোকান আরো অনেক স্থানে তখন দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, তার আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এইসব কেন্দ্রগুলি ছিল বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও তাঁদের মেলোমেশার জায়গা। যতীন্দ্রনাথের মেজ মামা ডাক্তার হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের শোভাবাজারের বাড়িও ছিল কলিকাতায় বিপ্লবীদের অনুরূপ একটি স্থান। এছাড়া, মির্জাপুর লেনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ি, ডাক্তার নীলরতন ধরের হোস্টেলের কথাও উল্লেখ্য। এই হোস্টেলেই বাঘা যতীন বেশির ভাগ রাত্রি অতিবাহিত করতেন।

ঠিকাদারি ব্যবসা চলতে লাগল বাইরে।

ভিতরে ভিতরে চলে বিপ্লবী দল সংগঠনের আসল কাজ। কলিকাতার কাজের ভার তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মীদের উপর তখন ন্যস্ত হয়েছিল আর এখানে ঝিনেদহতে বাস করে তিনি আগামী দিনের পরিকল্পনা রচনা করতে থাকেন এবং এইটাই ছিল তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভার শেষ নিদর্শন। যশোহরে এসে ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর শান্ত-শিষ্ট জীবনযাত্রা দেখে পুলিশের সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না যে, তলায় তলায় তিনি কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। জেলাবোর্ড ও গভর্ণমেণ্টের ঠিকাদার তিনি; কারবারটা বেশ ফলাও করেই ফেঁদেছিলেন। যশোহর সদরে ছিল এর প্রধান অফিস আর এখানে সেখানে ছিল শাখা অফিস। কিন্তু কারো দৃষ্টিতে তখন এটা ধরা পড়েনি অথবা কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, তাঁর এই ঠিকাদারি ব্যবসায়ে যতীন্দ্রনাথ যেসব কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন, আসলে তারা ছিল বিপ্লব আন্দোলনে তাঁরই সহকর্মী ও শিষ্য।

একদিন দুপুরবেলা। যতীন্দ্রনাথ খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর সাইকেলে চড়ে বাহির হওয়ার উপক্রম করছিলেন, তখন পত্নী ইন্দুবালা জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল সকাল ফিরবার চেষ্টা করো।

—কেন ?

—তোমার ফিরতে রাত হলে আমার ভয় করে।

—কিসের ভয় ইন্দু ?

—বুঝি পুলিশে আবার তোমায় ধরল। যতক্ষণ না তুমি বাড়ি ফেরো ততক্ষণ আমি অস্বস্তি ভোগ করি। কাল ছোট মামীমা এসে জিজ্ঞাসা করছিলেন আমাকে—

—কী জিজ্ঞাসা করছিলেন ?

—জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তুমি ঠিকাদারির কাজই করছ, না অন্য কিছু নিয়ে মেতে আছ।

—তুমি কী বললে তাঁকে ?

—বললাম তুমি ঠিকাদারির কাজই করছ।

—ঠিক বলেছ। ও কাজটা তো আমাকে করতেই হবে, ইন্দু, নইলে আমাদের দিন চলবে কেন ? তবে তার সঙ্গে আমার যা আসল কাজ সেটাও চলছে। তোমার কাছে কোনদিন কিছু গোপন রাখিনি, আজো রাখব না। তুমি জানো আমার জীবনের লক্ষ্য কী, ব্রত কী।

—জানি, তবু ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়ে মাঝে মাঝে ভয় হয়। যে আগুনে তুমি ঝাঁপ দিয়েছ, সে আগুন একদিন যদি তোমাকে গ্রাস করে ফেলে, তখন আমরা দাঁড়াব কোথায় ?

—আমার মামাদের তুমি জানো ইন্দু, বিশেষ করে মেজমামা আর ছোট মামাকে। এঁরা থাকতে তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এখন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছি, একমাত্র গুরুদেব জানেন এর ফলাফল কী। আমি আমার নিজের জন্য কিছু ভাবি না।

—ছেলেমেয়েদের জন্যেও না ?

—না।

ইন্দুমতী তখন তাঁর স্বামীর মুখের দিকে এইবার তাকালেন। সেখানে তিনি কী দেখলেন, তা তিনিই বুঝলেন, তাই আর কথা

না বাড়িয়ে নীরব রইলেন। অরবিন্দ মিথ্যা বলেন নি, যতীন্দ্রনাথ আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। ধীরে ধীরে সাইকেলটি নিয়ে তিনি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ঠিকাদারির আবরণে তিনি ঘুরে বেড়াতেন জেলায় জেলায়। এক-একদিন ভ্রমণও করতেন মাইলের পর মাইল সাইকেলে চেপে, নয়ত তাঁর প্রিয় বাহন ঘোড়াটির উপর চেপে। কী সাইকেল, কী ঘোড়া, এমন দ্রুত ছিল তাঁর গতি যে এক-একদিন তিনি এইভাবে একশত মাইল পথ অতিক্রম করতেন। পুলিশ অবশ্য তখনো তাঁকে অনুসরণ করে ফিরত, কিন্তু সরকারের মনে তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে নি যে নিজের জীবিকা অর্জন ভিন্ন যতীন্দ্রনাথের মনের অভিপ্রায় অন্যরকম হতে পারে, এমনই কৌশলের সঙ্গে তিনি ঠিকাদারির ব্যবসায়টি চালাতেন। তিনি যে সত্যিই এই কাজে মনোনিবেশ করেছেন লোকে তার প্রমাণও কিছু কিছু দেখতে পেল। ১৯০৫ সনের স্বদেশী বয়কটের দিনে যতীন কলকারখানা করে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, দেখা গেল যে ঠিকাদারি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে তিনি সেই একই ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিলেন। জেলায় জেলায় তৈরী হলো জেলাবোর্ডের নূতন নূতন রাস্তা, বড় বড় সাঁকো। যতীন্দ্রনাথ যখন যশোহরে অবস্থান করে গোপনে আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব রচনায় ব্যস্ত ছিলেন ঠিকাদারি কাজের আবরণে, তখন কলিকাতায় তাঁর সহকর্মীরাও চুপ করে বসেছিলেন না। পূর্বে যেসব মধুচক্রের উল্লেখ করেছি, সেইসব মধুচক্রেও তখন তাঁরা পুলিশের চক্ষে ধূলো দিয়ে নীরবে তাঁদের কাজ করে চলছিলেন।

১৯১৩। জুন মাস। কণ্টাই ও বর্ধমানে প্রবল বন্যা হলো। বিপ্লবীরা এর সুযোগ নিলেন। তাঁরা নেমে গেলেন সংকটত্রাণের কাজে। ফিলানথ্রপিক কাজের অন্তরালে বন্যাপীড়িত একটি অঞ্চলে এই সময়ে বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত বৈঠক বসে। যতীন্দ্রনাথ সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং সেইকালেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ পরি-

কল্পনার কথা সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন ও তাঁরা তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার কথা বলবার আগে প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। যতীন্দ্রনাথ যখন ঠিকাদারি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন সেই সময়ে (১৯১২) তাঁর ছোটমামার মারফৎ তাঁর হাতে একদিন একখানি ইংরেজি বই এসে পৌঁছল। বার্ণ হার্ডির লেখা *Coming War* ('আসন্ন যুদ্ধ')। বইটি তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করলেন এবং তিনি যেন এর মধ্যে নূতন আলোক পেলেন। জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যণ্ডের যুদ্ধ খুব শীঘ্রই বাধবে, এই রকম একটি অভিমত গ্রন্থকার খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এই বইটি পাঠ করার পর, নানা গোপন সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকেই যতীন্দ্রনাথের মনে আসন্ন মহাযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হতে থাকে। শুধু তাই নয়। তিনি আরো জানতে পারলেন যে, আগামী যুদ্ধে জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহায়তা করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন, এ খবরও তখন য়ুরোপে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের মাধ্যমে জানা গেছে। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধলে ভারতের উপর ইংরেজের বজ্রমুষ্টি যে কিছু পরিমাণে শিথিল হবে, যতীন্দ্রনাথ তা এই সময়েই অনুমান করেন। তখন থেকেই তিনি সমগ্র বৈপ্লবিক সংস্থাকে নূতন ভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন ও সমস্ত কেন্দ্রগুলিও নূতন করে ঢেলে সাজা দরকার মনে করলেন। যুদ্ধ যে শীঘ্রই বাধবে, এটা যেন তাঁর কাছে আপ্তবাক্যের মতো সেদিন মনে হয়েছিল বার্ণ হার্ডির বইটা পড়ার পর; আর সেই সঙ্গে এই কথাও তাঁর মনের মধ্যে না জেগে পারে নি যে এই সুবর্ণ সুযোগের ষোল আনা সদ্ব্যবহার করতে হবে।

একদিন বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সংকটত্রাণ কার্যে লিপ্ত সহকর্মীদের

কাছে যখন তিনি এইসব কথা বলছিলেন তখন সবাই যেন তাঁদের নেতার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দাদা তো বাজে কথা বলার মানুষ নন—এটা তাঁদের প্রত্যেকেরই জানা ছিল, তাই কেউই আর সাহস করে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা বা বিতর্ক করা সমীচিন মনে করলেন না। একজন শুধু বললেন, দাদা, আপনার এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে তো?

—তার মানে? তুই অবিশ্বাস করছিস যে জার্মানীরা সত্যি আমাদের টাকাকড়ি আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে কিনা?

—হয়ত তারা করল, কিন্তু আমরা তাই দিয়ে কতদূর সফলতা লাভ করতে পারব, সেইটাই ভাবছি।

—হ্যাঁরে, ভেবে-চিন্তে কি বিপ্লবের কাজ হয়? চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তবে সিদ্ধি অনিবার্য—আমরা না পারি, আমাদের পরে যারা আসবে, কিম্বা তাদের পরে যারা আসবে—একদিন না একদিন আমরা সিদ্ধিলাভ করবই। স্বাধীন আমরা হবই।

১৯১৩ সন থেকে বাংলার বিপ্লব প্রয়াস আবার শুরু হয় নূতন উদ্যমে। এই প্রয়াস এবার আত্মপ্রকাশ করল প্রধানত অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন, ডাকাতি আর রাজকর্মচারী হত্যার মাধ্যমে। পথের বাধা-স্বরূপ আততায়ীর নিধনে পশ্চাৎপদ হলে বিপ্লবীদের চলত না। রাজনৈতিক হত্যা প্রয়োজন হিসাবেই স্বীকৃত হয়েছিল সেদিন তাঁদের কাছে। নতুবা শুধু শুধু হত্যা বা ডাকাতির সমর্থন যতীন্দ্রনাথ কখনো করতেন না। এই দু'টি ক্ষেত্রে তিনি সবসময়ই একটা কঠিন নীতি বা rigid principle অনুসরণ করতেন। তাঁর নেতৃত্বের এটাও ছিল একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হিউম্যানিস্ট বাঘা যতীনের কাছে এটাই তো ছিল প্রত্যাশিত।

সেপ্টেম্বর মাস। সন্ধ্যাবেলা। কলেজ স্কোয়ারে গোলদীঘির ধারে, জনাকীর্ণ স্থানে নিহত হলো হেড কনস্টেবল হরিপদ ঘোষ। তিনজন যুবক প্রেরিত হয়েছিল গুপ্তসমিতি থেকে এই কাজের জন্য; কাজ হাসিল করে তারা জনতার মধ্যে উধাও হয়ে যায়। হত্যা-কারীদের পুলিশ ধরতে পারেনি। মৃত পুলিশ কর্মচারিটি বিপ্লবীদের একজনের সন্ধান পায়—বিপ্লবীরা যখন এই সংবাদ জানতে পারল তখন তারা ঐ কর্মচারীটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁদের প্রকৃত লক্ষ্য কিন্তু ছিলেন পুলিশ ইনসপেক্টর নৃপেন ঘোষ। হরিপদ ছিল তাঁরই সহকারী।

এর দু'দিন পরে ময়মনসিংহে পিকৃরিক এসিড বোমা ফেলে ইনসপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরীকে নিহত করা হয়। এই ইনসপেক্টরটি ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলার সময় (যা ইতিহাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত) বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন এবং তখনি বিপ্লবীদের খাতায় তাঁর নাম উঠে গিয়েছিল ও তাঁর উপর মৃত্যু-

দণ্ডাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। খুনের সঙ্গে চলে ডাকাতি—কলিকাতার কাছাকাছি আড়িয়াদহ, বরানগর, আলমবাজার, বৈদ্যবাটি প্রভৃতি জায়গায় ডাকাতির পর ডাকাতি চলতে থাকে।

টনক নড়ে পুলিশের।

বাসুকির ফণা তাহলে আবার দুলতে আরম্ভ করেছে, ভাবে তারা। এইসব ব্যাপার থেকে পুলিশ বুঝতে পারল যে, বিপ্লবীদল আবার সজাগ হয়ে উঠেছে। আর একদিন। সার্কুলার রোডের একটা বাড়িতে হানা দিয়ে শশাঙ্ক জানা বলে একজন বিপ্লবী যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই বাড়িতে পুলিশ সন্ধান পেল একরকম নূতন ধরনের বোমার—সিগারেটের খালি টিনের মধ্যে বোমা। এ যে কল্পনাও করা যায় না। এই জাতীয় বোমাই পরে ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল।

১৯১৪। চিৎপুর আর গ্রে স্ট্রীটের মোড়। দিবা দ্বিপ্রহরে নিহত হলেন দু'জন পুলিশ ইনসপেক্টার। এই সময় মুসলমান পাড়া লেনে গোয়েন্দা পুলিশের ডি. এস. পি. বসন্ত চাটুজ্যের বাড়িতেও বোমা ফেলা হয়। তিনি বেঁচে যান, কিন্তু তাঁর আরদালি নিহত হয়। আতঙ্কের কালোছায়া নেমে আসে লালবাজার পুলিশের সদর দপ্তরে। কমিশনার টেগার্টের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাঁর বিশ্বাস এইসব বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান যে একটার পর একটা ঘটছে, এর পিছনে নিশ্চয়ই একটি বিরাট মস্তিষ্ক সক্রিয় আছে আর আছে একজনের নেতৃত্ব। কে সে? যতীন মুখুজ্জে নয় ত?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলাদেশে দুই-তিনটি বিপ্লবী দল প্রধান হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথ এই দলগুলি একত্র করে একই নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত করার কথা সর্বপ্রথম চিন্তা করেন। কারণ তিনি একতার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই প্রয়াস সার্থক হয়েছিল এবং এটাও তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভার পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। এর ফলে বাংলার বিপ্লববাদের মধ্যে যে একটা নূতন

গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, ইতিহাস তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। সেদিন তিনিই হয়ে উঠলেন বিপ্লবদলের অবিসম্বাদী নেতা।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত রডা কোম্পানির গুদাম থেকে বন্দুক চুরির ঘটনাটি সেদিন কলিকাতা শহরে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা নেই। ১৯১৪। ২৬শে আগস্ট। য়ুরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যতীন্দ্রনাথেরও তৎপরতা এখন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। রডা য়্যাণ্ড কোম্পানি—শহরের বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার গুপ্তসমিতিগুলি এবার কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়লেন—সকলেই নূতন উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। উৎসাহিত হলেন সবচেয়ে বেশি তাঁদের নেতা বাঘা যতীন। বন্দুক পিস্তল সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে। এই চেষ্টার ফলেই রডা কোম্পানির পঞ্চাশটি মসার পিস্তল (Mauser Pistol) বিপ্লবীদলের করায়ত্ত হয়। বিপ্লবীদের কীর্তির মধ্যে এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই পিস্তল লুণ্ঠনের কাহিনী এইরকম।

এই মসার পিস্তলগুলি তৈরি হতো জার্মানিতে এবং এগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র বলে গণ্য ছিল। যতীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় অবস্থান করছেন। পিস্তল লুণ্ঠনের সমগ্র পরিকল্পনাটি তাঁরই ছিল এবং এজন্য তিনি তাঁর দলের নির্ভীক ও দুঃসাহসী একজন বিপ্লবীকে নির্বাচন করেন। তাঁর নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন অনুকূল মুখোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। আরো দু'জনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়; এঁদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে লুণ্ঠিত পিস্তলগুলি সরিয়ে লুকিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত এঁরা করবেন। এ ছাড়া আর যাঁরা এই দুঃসাহসিক কাজে সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বরিশাল দলের মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ-চৌধুরী প্রভৃতি।

রডা কোম্পানির দোকান থেকে পিস্তলগুলি লুঠ করা হয়নি—লুঠ করা হয়েছিল রাস্তা থেকে। কাস্টম-হাউস বা শুল্ক বিভাগের একজন কেরানীর কাছ থেকে যতীন্দ্রনাথ সংবাদ সংগ্রহ করেন যে ইংলণ্ড থেকে একটা জাহাজে করে রডা কোম্পানির নামে কিছু সংখ্যক মসার পিস্তল এসেছে ও শীঘ্রই ঐগুলি জাহাজ থেকে খালাস করে কোম্পানির গুদামে নিয়ে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ জাহাজ থেকে মাল খালাস করে থাকে কোম্পানির একজন বিশ্বস্ত সরকার। যে সরকারটির উপর এই কাজের ভার ছিল, যতীন্দ্রনাথ তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সরকারের সাহায্য ভিন্ন এই দুঃসাহসিক কাজ হাসিল করা যাবে না। নির্ধারিত দিনে জাহাজ থেকে রডা কোম্পানির ২০২ বাক্স ভর্তি অস্ত্র ও গুলিবারুদ নামল। যথারীতি সেই সরকারটি কাস্টম-হাউস থেকে ছাড়পত্র করিয়ে নিয়ে এই ২০২টি বাক্স রডা কোম্পানির নির্দিষ্ট গুদামে জমা দেয়। গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে মাল চলেছে গুদামে। পথিমধ্যে দশটি বাক্স যে অদৃশ্য হয়ে গেল তা জানা গেল না। কথিত আছে, একটি গাড়োয়ান এই ব্যাপারে বিপ্লবীদের সহায়তা করেছিল—এই গাড়োয়ানটি ছিল অনুকূল বাবুর নিজস্ব লোক। গুদামে মাল উঠল, জমা দেবার পর চালানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে গুদামবাবু দেখতে পান যে, দশটি বাক্স কম। কী করে এই দশটি বাক্স অন্তর্হিত হলো? আর কোথায় বা গেল কোম্পানির সেই সরকারটি?

এই রহস্যজনক চুরির কথা যখন জানাজানি হলো, তখন গোটা লালবাজার হকচকিয়ে গেল—কারণ ঐ দশটি বাক্সে ছিল পঞ্চাশটি বড় আকারের মসার পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড গুলি ছোড়বার উপকরণ। এতগুলি আগ্নেয়াস্ত্র করায়ত্ত হওয়াতে বিপ্লবী দলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেল এবং তখন এইগুলি প্রত্যেক প্রধান বিপ্লবীদলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্র-

গুলির সাহায্যে তাঁদের পরবর্তী কাজগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'আলিপুর বোমার মামলার পরে বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। ডক্টর দত্তের অনুরোধ-ক্রমে প্রখ্যাত বিপ্লবী ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখে দেন। এই অধ্যায়টি পাঠ করে জানা যায় যে ১৯১০ সনের পর থেকেই যতীন্দ্রনাথ সকলের কাছে ফুটে ওঠেন এবং সকলের কাছে তাঁর স্থান আরো উঁচুতে উঠে যায়। "তাঁর নির্ভীক বেপরোয়া ভাব তাঁকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলেছিল।" এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল বর্ধমান ও কাঁথির বন্যার পর থেকে। "বন্যাপ্লাবিতদের সেবার জন্য বাংলার তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। যতীন্দ্রনাথও আসেন। তাঁর যশ-সৌরভ আগে থেকেই বহমান ছিল, এবার তাঁকে সামনে পেয়ে কর্মীরা খুব খুশি।" যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের বিবর্তনটা আমাদের বুঝা দরকার। এই নেতৃত্বের বনিয়াদ ছিল আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং পারিপার্শ্বিক দ্বারা পরিপুষ্ট এই দুইটি গুণের সমাবেশ তাঁর চরিত্রের মধ্যে সকলেই লক্ষ্য করতেন। চরিত্র যেমন মধুর তেমনি উদার। ত্যাগের কথাটা বলা বাহুল্য। তিনি সর্বত্যাগী বিপ্লবী ছিলেন—স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সংসার সবই তাঁর ছিল, কিন্তু সে সবই তিনি যেন মনে মনে আহুতিস্বরূপ প্রদান করেছিলেন বিপ্লবযজ্ঞে। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা হলো—কোনরূপ হীনতা বা নীচতা তাঁর মধ্যে স্থান পায়নি—বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী সমাজে এইসব দিক দিয়ে বাঘা যতীন সত্যিই আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এই বিপ্লবী নায়কের চিন্তা, ভাবাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা প্রতিভার পরিচয় মিলত এবং সম্ভবত এই কারণেই অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি একটি অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব বিবিধ কারণেই তিনি

অগ্রজের গৌরব লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের দাদা। দাদা এবং নেতা। জাতির দুর্ভাগ্য, এই নেতৃত্বের পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি নিহত হন। বিবর্তনটা তাই অসমাপ্তই রয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার লিখেছেন: "হাজার হাজার বিপ্লবী সেদিন যতীন্দ্রনাথকে আপন আপন আদর্শের মূর্ত প্রতীক বলে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই তাঁরা সেদিন তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করলেন। যতীন্দ্রনাথের নিজ হাতে গড়া বিপ্লবী শিষ্যের সংখ্যা বড় কম ছিল না। অসংখ্য তরুণ যুবা তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে বিপ্লব সাধনার দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাছাড়া এখন (ইংরাজী ১৯১১ সালের পর থেকে) বাংলার এবং অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন দল তাঁকে সার্বভৌম নেতা হিসাবে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে লাগল।"

রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের আলাপ এই সময়েই অর্থাৎ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি লাভের কিছু পরে। এই দুই প্রতিভাধর বিপ্লবী-নায়কের মিলন এবং বাঘা যতীনের সঙ্গে চন্দন-নগরের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ রাসবিহারীর যোগদান সেদিন বাংলা তথা ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে যে একটা আশ্চর্য গতি দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন সর্ব-ভারতীয় প্রেক্ষপটে এই দু'জনেই তো রচনা করেছিলেন বিপ্লবের নবদিগন্ত। যতীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তা-ভাবনা যখন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সংহত হয়েছিল, সে সময়ে তিনি মনে মনে একটি চমকপ্রদ insurrection বা সর্ব-ভারতীয় অভ্যুত্থানের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এবং এজন্য ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ সংগঠনের ছক্ তৈরি করে রেখেছিলেন (যার প্রাথমিক পূর্বাভাষে ছিল দশম জাঠ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন), ঠিক সেই সময়ে দেখা যায় যে, ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রায়ে তাঁর সঙ্গে রাস-বিহারীর পরিচয় সংঘটিত হলো।

যতীন্দ্রনাথ যেন এতদিনে তাঁর মনের মত মানুষ পেলেন—যিনি তাঁর মতনই দেশপ্রেমিক, সংগঠনকুশলী, সাহসী ও আত্মত্যাগী মানুষ। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির নির্জন পঞ্চবটীতলায় মিলিত হলেন এঁরা দু'জন আর এঁদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যে পঞ্চবটীমূলে বসে একদা এক নিরক্ষর সাধক ধর্মজগতে বিপ্লব এনেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক স্থানে আজ মিলিত হলেন জাগ্রত বাংলার দুইজন বিপ্লবী নায়ক—যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী।

—দাদা, আপনার ইন্‌সারেকশনের প্ল্যান একটু বলুন। প্রশ্ন করলেন রাসবিহারী। উত্তরে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর সমগ্র পরিকল্পনাটির কথা বললেন। চিত্রটি তাঁর সামনে এমনভাবে তুলে ধরলেন যা রঙে ও রেখায় যেমন সুবিন্যস্ত তেমনি সম্পূর্ণ। নিখুঁত প্ল্যান—সামরিক প্রতিভা ভিন্ন এমন প্ল্যান রচনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। টেগার্ট যে একবার বলেছিলেন Jatin Mukherjee was a great stratagist, অর্থাৎ যতীন মুখার্জি যে একজন রণ-নীতিবিদ্ ছিলেন, সে কথা মিথ্যা নয়।

—আমি ঠিক করেছি যে, সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। কারণ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহটা এসেছিল মুখ্যত এদেরই মধ্য থেকে। তাদের মধ্যে প্রচার করতে হবে বিদ্রোহের মন্ত্র। তবে সাতান্নর বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলিকে সামনে রেখে এবার আমাদের কাজ করতে হবে। আমার আইডিয়া হলো সিপাহীরা বিদ্রোহ করবে আর আমরা অর্থাৎ বিপ্লবীরা সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের দুটো জিনিস অচল করে দেব—ট্রান্সপোর্ট আর কমিউনিকেশন। রেল লাইন উড়িয়ে দিতে হবে, টেলিগ্রাফের তার কাটতে হবে—এর ফলে সরকারের পক্ষে বিদ্রোহ দমনের জন্য গোরা সৈন্য পাঠান আর সম্ভব হবে না।

—তারপর ?

—তারপর এই অভ্যুত্থানকে জোরদার করে তোলার জন্য দেশের সর্বত্র ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণকে আহ্বান করতে হবে। তাহলেই দেশব্যাপী একটা সম্পূর্ণ সশস্ত্র 'আপরাইজিং' বা অভ্যুত্থান সংগঠিত হতে পারবে।

—তারপর ?

—ভারতে অবস্থিত মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যদের 'ওভার পাওয়ার' করে ফেলতে হবে।

—তারপর ?

—তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা গঠন করব স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট।

—আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, দাদা ?

—করি।

পরিকল্পনাটি শুনে সবাই একমত হলেন। আলোচনার শেষে যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করেন: "পারবে ইংরেজের সামরিক ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লাটা দখল করে নিতে ?"

—হ্যাঁ, পারব।

—বীরের যোগ্য কথা। কিন্তু তোমার কর্মক্ষেত্র বাংলা নয়, তুমি বাংলার বাইরে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ কর, এই আমার ইচ্ছা। তুমি মিরাট, পাঞ্জাব, জব্বলপুর প্রভৃতি বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি সর্বভারতীয় এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখ ঠিক করে রেখেছি।

—কবে ?

—২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫। সময় আমাদের হাতে খুব কমই আছে। কাজেই এখন থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হয়।

—তথাস্তু।

এই বলে এক বিপ্লবী নায়ক আর এক বিপ্লবী নায়ককে জানালেন অভিনন্দন। কালের পটে অঙ্কিত হয়ে গেল একখানি বর্ণাঢ্য চিত্র।

এইবার আমাদের মূল কাহিনীতে ফেরা যাক।

রডা কোম্পানির পিস্তল লুন্ঠিত হওয়ার ছয় মাস পরে যতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে দুইটি দুঃসাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। একটি গার্ডেনরীচে, অপরটি বেলেঘাটায়। এই দুটির মধ্যে প্রথমটিই ছিল বিশেষভাবে দুঃসাহসিক। ডাকাতি করার উদ্দেশ্য ছিল অর্থসংগ্রহ। অর্থের প্রয়োজন প্রতিপদেই বিপ্লবীদের ছিল। নানা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে তাঁদের এই অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। নিজেদের প্রয়োজনে এই কাজ তাঁরা কোনদিনই করেন নি। অন্তত প্রথম যুগের বিপ্লবীদের সম্পর্কে এই কথা সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। দূর প্রাচ্যে তখন প্রবল ভাবে বিপ্লবের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যতীন্দ্রনাথের কাছে এ সংবাদ তখন নানা সূত্রে এসে গিয়েছে। আমেরিকায় 'গদর পার্টি' নামে যে বিল্লবী দল ছিল, সেই দলের মুখ-পাত্রের নাম ছিল 'গদর'। ('গদর' কথাটির অর্থ বিপ্লব।) সেই সময় দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে—যথা, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, ব্যাঙ্কক সিঙ্গাপুর ও বাটাভিয়ায়—বহু ভারতীয় বাস করতেন। এইসব ভারতীয়দের মধ্যে সকল প্রদেশের মানুষই ছিল। গদর পার্টির 'গদর পত্রিকা' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়ে এঁদের মধ্যে প্রচারিত হতো। "এর ফলে দূর প্রাচ্যে বিপ্লববাদের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন, সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য কাজ করার ও প্রাণ বিসর্জন দেবার প্রেরণায় হাজার হাজার ভারতীয় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।" এঁদেরই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলা থেকে যোগ্য লোকদের প্রেরণ করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বোধ হওয়াতেই যতীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর দলের একজন সহকর্মীকে বলে-

ছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর একলক্ষ টাকার দরকার। যেমন করেই হোক এই টাকা অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে।

প্রয়োজন আরো একটা কারণে দেখা দিয়েছিল এবং সম্ভবত সেইটাই ছিল ডাকাতি দ্বারা অর্থসংগ্রহ করার প্রধান কারণ। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন 'বার্লিন কমিটি' থেকে তাঁর কাছে এই মর্মে সংবাদ এসে গেছে যে, ভারতবাসীদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের কাজে, সাহায্য করবার জন্য জার্মান সরকার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। য়ুরোপে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদলের যে শাখাটি বার্লিনে থেকে এইসব ব্যবস্থা করেছিলেন সেই শাখার নাম হলো 'বার্লিন কমিটি'। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। দূর প্রাচ্যে অবস্থিত জার্মান কনসলদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে বাংলা থেকে উপযুক্ত লোককে পাঠাতে হয় এবং পাঠাতে গেলে টাকার দরকার। এই টাকা কারো কাছে চাইলে পাওয়া যাবে না, যতীন্দ্রনাথ তা জানতেন বলেই তিনি এই দু'টি ডাকাতির পরিকল্পনা করেন।

গার্ডেনরীচ ডাকাতি সম্পর্কে 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থের লেখক যে বিবরণ দিয়েছেন তারই সংক্ষিপ্ত সার এখানে উদ্ধৃত হলো:

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে বিপ্লব কার্যের বিবিধ প্রয়োজনে অর্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী গার্ডেনরীচে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়া জুট মিলের কুলিদিগকে বেতন ও বোনাস দিবার জন্য কোম্পানির হেড অফিস হইতে কোম্পানির সরকার এবং দুইজন দারোয়ান একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া ১৮,০০০৲ টাকা লইয়া বদরতলা অভিমুখে রওনা হয়। ১৯১৫ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। টাকা লইয়া একখানি গাড়ি রওনা হইবে, বিপ্লবীগণ এই সংবাদ পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করে। তদনুযায়ী হিসাব

করিয়া তাহারা হাওড়া স্টেশনে যায়। সেখানে একজন পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভারের ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শিয়ালদহ স্টেশন হইয়া অনুমান দিবা আড়াইটার সময় গার্ডেনরীচ সার্কুলার রোডের মোড়ে উপস্থিত হয়। আঠার হাজার টাকা সমেত যে ঘোড়ার গাড়ি পূর্বে রওনা হইয়া গিয়াছিল, সেই গাড়ি কিছুকাল পরেই ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছায়। ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ির সম্মুখে আসিতেই, ট্যাক্সি হইতে বিপ্লবীগণ নামিয়া পড়েন। যতীন্দ্রনাথের সম্মতি ও নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, মাদারিপুর দলের চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বলিয়া জানা যায়।

"ঘোড়ার গাড়িখানাকে থামিতে হুকুম দিয়াই বিপ্লবীগণ আরোহী-দের জোর করিয়া নামাইয়া দেয় ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টাকার তোড়া লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া আসে। এইসময়ে রাস্তার লোক জমায়েত হইলেও, বিপ্লবীগণের হাতে রিভলবার দেখিয়া কেহ কাছে আসিতে সাহসী হয় না। কিন্তু সমস্যা হইল ট্যাক্সি চালানো লইয়া। পাঞ্জাবী ড্রাইভার তাহার ট্যাক্সির আরোহীদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাহা-দের লইয়া ট্যাক্সি চালাইতে কিছুতেই রাজী হয় না। কালবিলম্ব বিপজ্জনক—তখন ড্রাইভারকে ভীষণভাবে প্রহার করা হয় ও তাহাকে শেষপর্যন্ত ট্যাক্সি হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তখন দলের একজন ট্যাক্সি চালাইয়া দ্রুতগতিতে বারুইপুর চলিয়া আসে। বারুইপুরে গিয়া আর এক বিপদ। একটা টায়ার ফাটিয়া ট্যাক্সি অচল হইল। তখন সেখানে স্থানীয় একজন লোকের জিম্মায় ট্যাক্সি রাখিয়া, একটি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বিপ্লবীরা প্রথমে জয়নগর এবং তারপর সেখান হইতে নৌকা করিয়া টাকি যান। ইতিমধ্যে দু'টি ট্রাঙ্ক কিনিয়া টাকাগুলি উহাদের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। হাসনাবাদে আসিয়া বিপ্লবীরা মার্টিন কোম্পানির ছোট রেলে পাতিপুকুর আসিয়া নামেন। সেখান হইতে ২০ নম্বর ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে তথাকার অন্যতম বিপ্লবী আড্ডায় উপস্থিত হন।"

এর দশদিন পরে বেলেঘাটায়, জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর গদী থেকে লুঠ করা হয় বত্রিশ হাজার টাকা। এই দুটি ডাকাতিতে অপূর্ব সাহস, বীরত্ব ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন বিশেষ করে দু'জন—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। এরপরে কলিকাতায় উপর্যুপরি আরো কয়েকটি ডাকাতি হয়েছিল। লুণ্ঠিত অর্থের সমস্তই নেতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে ডাকাতিতে পাওয়া টাকা দিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সিত কাজে হস্তক্ষেপ করেন এবং তা সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলার জন্য তিনি নরেন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজনকে বাংলার বাইরে প্রেরণ করেন, অতঃপর আমরা সেই চাঞ্চল্যকর 'জার্মান প্লট' বা জার্মান ষড়যন্ত্রের কথা এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করব।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত বহু সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট ও বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্মান সরকার য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের অনুরোধক্রমে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত হানবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যদানে আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, কার্যত তাঁরা এবিষয়ে অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। জার্মান সরকার শুধু য়ুরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছ থেকেই তাঁদের বিপ্লব প্রয়াসের কথা অবগত হননি, সংবাদপত্রের মাধ্যমেও তাঁরা বাংলার বিপ্লবীদলের চাঞ্চল্যকর বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সংবাদ পাঠ করেন এবং অবশেষে জার্মান গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এইসব বিপ্লবীদের দিয়েই ব্রিটিশ শক্তির অন্যতম মূল উৎস নষ্ট করা যাবে। তখন থেকেই ভারতে য়ুরোপ-প্রত্যাগত বিপ্লবীদের মাধ্যমে খবর আসতে থাকে যে, জার্মান সরকার অস্ত্র ও অর্থসাহায্য শীঘ্রই পাঠাবেন।

ইতিমধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। সর্বভারতীয় যে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা যতীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাকে সফল করে তোলার জন্য তিনি বাংলা দেশে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং কথিত আছে

যে, তিনি তখন বাংলার সৈন্যদলের মধ্যে উত্তম সংগঠন তৈরি করে ফেলেছেন। ফোর্ট উইলিয়মে যে ভারতীয় সৈন্য ছিল, তারা বিপ্লবে যোগদান করবে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃপাল সিং নামক এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমগ্র পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপায়িত হল না, তখন রাসবিহারী এদেশে কিছুকাল আত্মগোপন করে থেকে, অবশেষে একদিন কলিকাতা থেকে জাহাজে চেপে ছদ্মনামে জাপান চলে যান।

কিন্তু দমলেন না একজন।

তিনি যতীন্দ্রনাথ। তাঁর অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কিছু ছিল না বা কোন কিছুতে নিরুৎসাহিত হওয়া তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিল না। জার্মান ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এইবার তিনি সচেষ্ট হলেন ও পূর্ণোদ্যমে এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনিও তখন আত্মগোপন করে আছেন কলিকাতায়, কারণ গার্ডেনরীচ ও বেলে-ঘাটার ঘটনার পর পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মনে এই সন্দেহ প্রবল হয় যে, এইসবের পিছনে যতীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কই সক্রিয় আছে, আর কারো নয়। সেই মাথার উপর তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করলেন। যেমন করেই হোক, ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথাটা তাঁদের চাই-ই। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছিল বটে, কিন্তু তা তাঁদের হাত পিছলিয়ে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ অতঃপর তাদের সমস্ত শক্তি ও কৌশল নিয়ে টেগার্টের নেতৃত্বে সর্বক্ষণ যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুচরদের অনুসরণ করতে থাকে।

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী য়ুরোপ থেকে ১৯১৫ সনের গোড়ায় বোম্বাই পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই যতীন্দ্রনাথের সংযোগ ছিল। তিনি এসে বলেন, জার্মান থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে; দুটি কেন্দ্রে আসবে এই অস্ত্র-সম্ভার—বাটাভিয়া আর ব্যাঙ্ককে। এখন বাটাভিয়াতে

বাংলার বিপ্লবীদলের একজন যোগ্য প্রতিনিধির অবিলম্বে যাওয়া দরকার। এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য বিপ্লবীদের এক অধিবেশন বসে এবং ঐ অধিবেশনেই জার্মানদের সঙ্গে আলোচনার জন্য নরেন্দ্রনাথকে বাটাভিয়া পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি মিঃ মার্টিন এই ছদ্মনামে বাটাভিয়া যাত্রা করেন (এপ্রিল, ১৯১৫)। মার্টিন বাটাভিয়াতে পৌঁছে জার্মান কনসাল থিওডোর হেলফ্রিস্তের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য 'ম্যাভারিক' নামে একটি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যানপেড্রো বন্দর থেকে করাচী বন্দর অভিমুখে যাত্রা করেছে। মার্টিন সে জাহাজ করাচীতে না পাঠিয়ে বাংলা অভিমুখে ঘুরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সাংহাইয়ের জার্মান কনসাল এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ঠিক হয় যে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে এই জাহাজটি ভিড়োবার ব্যবস্থা হবে। সেখান থেকেই নরেন্দ্রনাথ ওরফে মার্টিন কলিকাতায় হ্যারি য়্যাণ্ড সন্স-এর দোকানে এক সাংকেতিক তারবার্তায় তাঁর সহকর্মীদের জানালেন, "ব্যবসা আশাপ্রদ।" এইসব ব্যবস্থা করে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই জাহাজে ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪০০ করে গুলি আর সেই সঙ্গে দুইলক্ষ টাকা আসবে, এই বার্তা বহন করে নরেন্দ্রনাথ যখন বিপ্লবী কেন্দ্রে ফিরলেন তখন যতীন্দ্রনাথ বললেন, "Now Let us to action.—অর্থাৎ, এইবার আমাদের কাজের কথা চিন্তা করা যাক। এই action বা কাজ বলতে ম্যাভারিক জাহাজ থেকে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র নামানোর জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্পন্ন করা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অস্ত্রশস্ত্র তিন ভাগে ভাগ করে (১) পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, (২) কলিকাতায় ও (৩) বালেশ্বরে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যতীন্দ্রনাথ তখন তাঁর কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বরে কাপ্তিপোদায় অবস্থান করছিলেন। সেইখানে বসেই তিনি এইসব

সংবাদ জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই জাহাজ শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল না।

বিপ্লবীদের স্বপ্ন দেখাই সার হলো।

ইতিমধ্যে মার্টিন আবার ফিরে গেছেন তাঁর দৌত্যের কাজে।

তখন (জুলাই মাস) ব্যাঙ্কক থেকে সংবাদ এলো যে, শ্যামের জার্মান কনসাল যথেষ্ট গুলি বারুদসহ পাঁচ হাজার রাইফেল ও ত্রিশ লক্ষ টাকা আর একটি জাহাজে করে রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। কলিকাতার বিপ্লবীরা তখন এই দ্বিতীয় জাহাজটির অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়া ও বালেশ্বরে নামিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। পুলিশ কিন্তু পূর্বাহ্লেই রায়মঙ্গলে এই অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রের সংবাদ পায় ও সতর্কতা অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের এই উদ্যমটিও ব্যর্থ হয়। তখন থেকেই ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে। তিনি যতীন্দ্রনাথ।

"বালাশোর—বুড়িবালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট,
উদয়-গোধূলি রঙে রাঙা হয়ে
উঠেছিল যথা অস্তপাট।"

১৯১৫ সালটি ছিল বাঘা যতীনের জীবনের শেষ বৎসর।

আবার বাংলার প্রথম পর্বের বিপ্লব প্রয়াসেরও শেষ বৎসর এইটি।

সর্বভারতীয় অভ্যুত্থান, সুদূর প্রাচ্যে বিপ্লব প্রয়াস,—সবকিছু যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। যে স্বাধীন ভারতের জন্য যতীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায়, তা আর বাস্তবে রূপায়িত হলো না। এই সংকটকালে, ১৯১৫ সালের গোড়াতেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁর মাথার উপর একটা বিরাট অঙ্কের মূল্য ধার্য করেছিলেন। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর ফটো, যাতে সহজেই তাঁকে সনাক্ত করা যায় ও গ্রেপ্তার করা যায়। এ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবী নায়ককে শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করতে দেখা যেত। একদিন যখন তাঁর একজন শিষ্য তাঁর এই বেপরোয়াভাবের জন্য তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, তখন তার উত্তরে একটু মৃদু হেসে যতীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন, "যদি আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা সবাই এইভাবে আত্মগোপন করে থাকি, তা'হলে আমরা এই পথে পা বাড়িয়েছি কিসের জন্য?"

নেতার উপযুক্ত কথাই বটে!

আগেই বলেছি, গার্ডেনরীচ ডাকাতির সূত্র ধরেই ধর-পাকড় আরম্ভ হয়। বাঘা যতীন এই সময়ে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন।

একদিন। সেদিন কলিকাতার একটি কেন্দ্রের একটি গোপন

বৈঠকে যোগদান করতে এসেছেন যতীন্দ্রনাথ। এমন সময়ে ঘরের বাইরে হঠাৎ কার যেন ছায়াপাত হলো। ঘরের দরজা ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ ছিল। একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—যতীনদা আছেন নাকি ?

—যতীনদা! সবিস্ময়ে ভাবেন যতীন্দ্রনাথ। এ নিশ্চয়ই একজন স্পাই। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তপ্রিয়কে তিনি হুকুম দিলেন, "Shoot him." —ওকে গুলি করে খতম কর। অমনি চিত্তপ্রিয় বাঘের মতো লাফিয়ে বাইরে এসে আগন্তুককে বজ্রগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, কে আপনি ?

—আমি নীরদ—নীরদ হালদার। দাদা আছেন নাকি ?

ক্রুম! ক্রুম! চিত্তপ্রিয়ের হাতের অগ্নিনালিকা গর্জে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নীরদ হালদার ঘটনাক্ষেত্রেই মারা গেল না—সে মারা গেল কয়েকদিন বাদে হাসপাতালে একটি স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর। "আমার মৃত্যুর জন্য যতীন মুখার্জি দায়ী"—এই মর্মে সে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তার মৃত্যুর পূর্বে। এই ঘটনার পর সেইদিন বৈঠক আর চলল না—সবাই ফিরে যায় নিজের নিজের গোপন আস্তানায়। কলিকাতায় অবস্থান আর নিরাপদ নয় ভেবে যতীন্দ্রনাথ বাগনানের অতুলপ্রসাদ সেনের গৃহে কিছুদিন আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন বাগনান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অতঃপর নীরদ হালদারের মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তির সূত্রটি ধরে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৎপর হতে থাকে। চিত্তপ্রিয়ের গুলিতে নীরদ হালদার যদি তখনি মরত তা'হলে পুলিশের সাধ্য ছিল না যতীন্দ্রনাথের সন্ধান পাওয়া। বাগনানে কিছুদিন অবস্থান করে যখন বুঝলেন বাগনানও নিরাপদ নয়, তখন তিনি চলে আসেন মহিষাদলে। এখানেও দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হয়নি। অতঃপর তিনি অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লী কাপ্তিপোদায় (বালেশ্বর শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত) গমন করেন। ময়ুরভঞ্জের ঘন অরণ্য-পরিবেষ্টিত এই

নির্জন দ্বীপে তিনি একা আসেন নি—তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো চারজন, যথা—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (বয়স একুশ); নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (বয়স তেইশ); মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (বয়স সতেরো) আর জ্যোতিষ পাল (এঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি)। এইখানে অবস্থান করার উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় যে জাহাজখানিতে অস্ত্রশস্ত্র আসার কথা ছিল সেই জাহাজের জন্য অপেক্ষা করা।

যতীন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করেন মার্চ মাসের শেষ ভাগে। প্রথমে তিনি বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এমপোরিয়ামে শৈলেশ্বর নামক বিপ্লবীর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি রেখে চিত্তপ্রিয় প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তিপোদা অভিমুখে রওনা হন। জার্মান জাহাজ আসবে, সেই আশায় তিনি লোকালয় ত্যাগ করে, বঙ্গোপসাগরের নির্জন তটভূমির দিকে যাত্রা করেন। বালেশ্বরে যেখানে মহানদী এসে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, যতীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে তাঁর গোপন আস্তানা তৈরি করলেন। তাঁর আশা ছিল, জার্মান জাহাজ সেইখানেই আসবে। দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষা কিন্তু প্রতীক্ষাতেই পর্যবসিত হয়। শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থান করে তিনি ইউনিভার্সাল এমপোরিয়ামের মাধ্যমেই বাইরের সঙ্গে আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। "কাপ্তিপোদাতে যতীন্দ্রনাথ গেরুয়া রঙের কাপড় পরে সাধুবেশে থাকতেন। লোকে তাঁকে সাধুবাবা বলে জানত। পল্লীগ্রামের লোকজনের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশা করতেন। কারো অসুখ-বিসুখ করলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন।"

যতীন্দ্রনাথ যখন কাপ্তিপোদার নির্জন পল্লীতে অবস্থান করে জার্মান জাহাজের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন, তখন কলিকাতার "গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহ্যাম সাহেব বিপ্লবী সংগঠনের সূত্র আবিষ্কার করবার জন্য ও বিপ্লবী নায়কদের সন্ধান করে গ্রেফতার করবার জন্য স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছেন।" তাঁকে এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন আরো দু'জন উচ্চপদস্থ

পুলিশ অফিসার—লোম্যান ও টেগার্ট। সরকার যখন জুলাই মাসে রায়মঙ্গলে জার্মান অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রের সংবাদ পান তখন থেকেই পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ৭ই আগস্ট হ্যারি য়্যাণ্ড সন্সের অফিসে অতর্কিতে খানাতল্লাসী হয় ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। এখানকার কাগজপত্রের সূত্র ধরেই পুলিশ যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বর যাওয়ার সংবাদ পায় এবং সেই সংকেতের উপর নির্ভর করে পুলিশের একটা দল বালেশ্বর যাত্রা করে। পুলিশ যে তাঁদের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে, এই সংবাদ যতীন্দ্রনাথ জানতেন না।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ; ১৯১৫।

কলিকাতায় 'হ্যারি য়্যাণ্ড সন্স' নামক বিপ্লবীদের প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি থেকে প্রাপ্ত একখানি একশত টাকার নোটের সূত্র ধরেই পুলিশ ঐ তারিখে বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম-এর কেন্দ্রটি আবিষ্কার করে। ৪ঠা থেকে ৯ই—এই ছয়দিন তাঁরা যথেষ্ট সময় পেলেও ঐ অঞ্চলে বিপ্লবী সংস্থার কেন্দ্র, কর্মী ও সমর্থক যথেষ্ট না থাকায়, বিপ্লবী পাঁচজন সশস্ত্র হয়েও ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারেন নি। কাপ্তিপোদার জনসাধারণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর আস্তানাটি 'সাধুবাবার আশ্রম' নামে পরিচিত হয়েছিল। গ্রামবাসীদের সুখদুঃখের তিনি সঙ্গী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ও য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় তিনি বেশ নিপুণ ছিলেন এবং অনেক সময়ে দেখা যেত যে অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত রোগীদের তিনি তাঁর আবাসে নিয়ে এসে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধরে তাদের চিকিৎসা করতেন, শুশ্রূষা করতেন। এখানে তিনি একটি ছোট্ট মুদীর দোকানও খুলেছিলেন এবং অনেক সময়েই স্থানীয় লোকদের ধারে জিনিসপত্র দিতেন। এ ছাড়া, প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য ক্লাস নিতেন। স্থানীয় ঠিকাদার মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ এইখানেই পরিচিত

হন। ইনি ছিলেন তাঁর খুবই হিতৈষী। হিতৈষী এবং বিশ্বাসী। এঁর কাছেই তিনি তাঁর দলের টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখতেন।

কিন্তু তাঁর কাপ্তিপোদার দিনগুলি কেবলমাত্র এইসব কাজেই অতিবাহিত হতো না। বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতা ও কর্মীরা নিয়মিতভাবে এখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, আলোচনা করতেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণ করতেন। জুন মাসে দূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে নরেন্দ্রনাথ কাপ্তিপোদায় এসে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে বাটাভিয়াতে জার্মান কনসালের কি কথাবার্তা হয়েছিল, সেসব তাঁকে অবগত করান। এইখানেই নরেন্দ্রনাথ জার্মানির আন্তরিক মিত্রতা ও সহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ যতীন্দ্রনাথের পায়ে অনেকগুলি সোনার মোহর রেখে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে একটি মানচিত্রও তাঁর হাতে তিনি প্রদান করেন। ঐ ম্যাপে ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও জাহাজ কোথায় ভিড়বে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহচরদের কাছে এই সংবাদ বলেন এবং সাগ্রহে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজের জন্য বঙ্গোপসাগরের সেই নির্জন প্রান্তে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু হায়, তখন কে জানত যে বিপ্লবী-নায়কের সেই প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা মাত্রে পর্যবসিত হবে। আয়োজন সম্পূর্ণ করবার জন্য আগস্ট মাসে যতীন্দ্রনাথ পুনরায় নরেন্দ্রনাথ ও ফণী চক্রবর্তীকে বাটাভিয়াতে প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাপানের পথে সিঙ্গাপুর থেকে রাসবিহারী কলিকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়ে' প্রচুর টাকা পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর জীবনে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ এই দিনগুলির মধ্যে একদিনের একটি ঘটনা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। দিনের সূর্য তখন অস্তাচলে যাচ্ছে। যতীন্দ্রনাথ তন্ময়চিত্তে সেই সোনা-গলানো সূর্যাস্ত দেখছেন। দেখতে দেখতে তিনি যেন আকাশপটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করলেন। কাপ্তিপোদার সমগ্র বনানীর উপরে তখন নেমে এসেছে

ধ্যানের প্রশান্তি। মণীন্দ্র চক্রবর্তী দৈবক্রমে সেই উদ্ভাসিত মুহূর্তে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি এসে দেখেন যতীন্দ্রনাথ তন্ময়চিত্তে সূর্যাস্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন, তাঁর চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত। মণীন্দ্রবাবু নীরবে তাঁর পাশে এসে বসলেন। যতীন্দ্রনাথের তখনকার অবস্থা তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি হঠাৎ আমার হাত দু'টি ধরে চীৎকার করে বললেন—ঐ দেখুন, ঐ দেখুন ঐখানে!" সেই স্পর্শে আমার সর্বদেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—আমার সর্বদেহে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হলো না শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। কোথায় আমি পাব সেই দৃষ্টি? আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাবার আগ্রহ সত্ত্বেও, সেই দিব্যদর্শন লাভের যোগ্যতা আমার মতো লোকের কোথায়? কিন্তু আমি যতীনকে সেই দিব্যভাবমণ্ডিত অবস্থায় তন্ময় দেখে রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।.........বিপ্লবী-নায়ক হিসাবে তার কত চিন্তা-ভাবনা আর কত না সমস্যার বোঝা তার মাথার উপরে। কিন্তু সেই মুহূর্তটিতে আমার মনে হলো তিনি যেন সবকিছু বিস্মৃত হয়েছেন এবং সেই আচ্ছন্নের ভাবেই বসে রইলেন। আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন অন্য জগতের অধিবাসী। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। সেদিন আমি বিপ্লবী যতীনের মধ্যে এক নূতন যতীনকে আবিষ্কার করেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না।"

এই ঘটনাটি যে বাঘা যতীনের জীবনের উপর একটি নূতন আলোক-সম্পাত করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয় নেই। আমরা জানি, তাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে, এই জীবনে তিনি এমন একজন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় লাভ করেছিলেন ভারতের ধর্মগুরুদের মধ্যে যাঁর একালে অনন্যলব্ধ মর্যাদা ছিল। তাই ভোলানন্দ গিরি মহারাজের প্রিয় শিষ্যের জীবনের শেষ অধ্যায়ে

যে এমন একটি ঘটনা ঘটবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কথিত আছে, আলিপুরে নির্জন কারাবাসের সময়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা হয়েছিল—তাঁরও বাসুদেবের দর্শন লাভ হয়েছিল এবং সেই দর্শনের পরিণতি শেষপর্যন্ত তাঁকে দিব্যজীবন পথের পথিক করেছিল। বালেশ্বরের যুদ্ধে নিহত না হলে, অরবিন্দ-সহচর যতীন্দ্রনাথের জীবনের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। বিপ্লবী জীবনের এই যে metamorphosis বা রূপান্তর, ইহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগোম্য হওয়ার জিনিস নয় বলেই এই বিষয়ে নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। তবে একটা জিনিস বুঝা খুব শক্ত নয়। অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ দুজনেই মনেপ্রাণে ছিলেন গীতার মানুষ। এঁদের দু'জনেরই জীবন ছিল গীতার সুরে সাধা। গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভাবাদর্শ এঁদের দু'জনেরই জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমরা জানি, যতীন্দ্রনাথের পকেটে সব সময়ে একখানি গীতা থাকত। শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বড় বিপ্লবী ভারতবর্ষে আর ক'জন জন্মেছেন? যতীন্দ্রনাথ যে সাধারণ শ্রেণীর বিপ্লবী ছিলেন না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথের কোন উদ্দেশ না পেয়ে, একটি ক্ষীণসূত্র ধরে জি. ডি. ডেনহ্যাম (ইনি তখন কেন্দ্রীয় সরকারে গোয়েন্দা বিভাগের ডি. আই. জি. ছিলেন), স্যর চার্লস টেগার্ট (ইনি তখন কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন) ও সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এল. এন. বার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। ৫ই সকালে বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল্ এমপোরিয়াম থানাতল্লাসী করতে গিয়ে তাঁরা একটুকরো কাগজের সন্ধান পান। সেই কাগজে 'কাপ্তিপোদা' কথাটি লেখা ছিল। তাঁদের তখন সন্দেহ

হয় যে, যতীন্দ্রনাথ হয়ত এখানে অবস্থান করছেন। ৫ই রাত্রিবেলায় বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. জি. কিলবি, সার্জেন্ট রাদারফোর্ড ও বিহার-উড়িষ্যার ডি. আই. জি. রাইল্যাণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা কাপ্তিপোদার অভিমুখে যাত্রা করেন। যতীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার বালেশ্বর অভিযানে টেগার্টের নামের সঙ্গে লোম্যানের নামের উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যটি ভুল। লোম্যান সেখানে যাননি।

"ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম তল্লাসি করে কাপ্তিপোদার হদিস পাওয়ামাত্র ডেনহ্যাম তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ এইখানেই আত্মগোপন করে আছেন। আর যতীন্দ্রনাথ যে খুব অরক্ষিত অবস্থায় আছেন, তাও ডেনহ্যাম উপলব্ধি করলেন। ...কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যত অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তবু তিনি যতীন্দ্রনাথ। প্রভূত শক্তি সঙ্গে না নিয়ে তাঁর নিকটস্থ হওয়া যায় না, এটাও ডেনহ্যাম বেশ বুঝেছিলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ আয়োজন করে ফেললেন।" এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে কোন্ কোন্ অফিসার ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। একটি সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠিত হলো এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ডেনহ্যাম, টেগার্ট, কিলবি, রাদারফোর্ড ও রাইল্যাণ্ড। প্রায় তিনশত সশস্ত্র সৈন্য এঁদের নেতৃত্বে সেদিন অভিযান করেছিল কাপ্তিপোদায় মাত্র পাঁচজনকে গ্রেফতার করবার জন্য। নিঃসন্দেহে এই অভিযান ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। এর প্রয়োজনও ছিল। কারণ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিৎ যিনি টলিয়ে দিয়েছেন তাঁকে গ্রেফতার করতে একটি বাহিনীর দরকার বৈকি। ইংরেজ বীরের জাতি। তাই যতীন্দ্রনাথকে তারা বীরের মর্যাদাই দিয়েছিল সেদিন, মনে হয়। সেই বিপুল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিল কামান, বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, গোলাগুলি, বারুদ, সন্ধানী আলো এবং আরো কতো সরঞ্জাম। অফিসাররা বালেশ্বর থেকে প্রথমে গিয়েছিলেন হাতীচেকা।

৭ই সন্ধ্যাবেলা তাঁরা সবাহিনী কাপ্তিপোদা পৌঁছলেন। তাদের আগমন-বার্তা পেয়েই যতীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিনি কখনো কোন অবস্থায়ই অসতর্ক থাকতেন না। তাঁর বিশ্বস্ত প্রহরীরা জলে স্থলে সর্বক্ষণ তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখত। "দূর থেকে হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়ে এক প্রহরী ছুটে এসে তাঁকে সংবাদ দিল। সংবাদ পেয়েই তাঁর সন্দেহ হলো। রাত্রে এদিকে হাতী আসছে কেন?" তখন মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি বাইরে এসে একটা উঁচু জায়গা থেকে চারদিকে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর বুঝতে দেরী হল না হাতী চেপে কারা আসছে। শত্রু দ্বারে সমাগত—তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হবে এইবার। সম্মুখ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক চিত্তেই তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্ষিপ্র পদে তিনি এলেন আস্তানায়। কেবলমাত্র চিত্তপ্রিয় আর মনোরঞ্জন তখন 'আশ্রমে' ছিল। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব তখন উত্তেজনায় অস্থির। আশ্রমে ঢুকেই তিনি তাঁর সহকর্মী দু'জনকে বললেন, ওরা এসে গেছে। তোরা তৈরী হয়ে নে।

—কারা এসেছে, দাদা? চিত্তপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুলভাবে।

—পুলিশ।

—ক'জন পুলিশ, দাদা? জানতে চাইল মনোরঞ্জন।

—তাতো জানিনে, তবে মনে হয় একটা বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

—দাদা, আমাদের জন্য আপনি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বোধ করবেন না। আপনি যদি এখান থেকে একা চলে যেতে চান, কারো সাধ্য আপনার হদিশ পায়। আমাদের অনুরোধ আপনি নিজেকে রক্ষা করুন, তা'হলে ভবিষ্যতে আপনার নির্দেশে আরো অনেক বৈপ্লবিক প্রয়াস সংগঠিত হতে পারবে। আমাদের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না, দাদা।

যতীন্দ্রনাথ এই কথার কোন উত্তর দিলেন না।

ধূর্জটির ললাটনেত্রের মতো তাঁর চক্ষু দুইটি যেন জ্বলে উঠল।

তিনি তখন তাঁর আশ্রয়দাতা মণীন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গেলেন ও তাঁকে জানালেন পুলিশের আগমনবার্তা। সেখান থেকে তিনি ঝড়ের বেগে ছুটলেন তালডিহি গ্রামের দিকে। জ্যোতিষ ও নীরেন তখন এখানে অবস্থান করছিল। কাপ্তিপোদা থেকে তালডিহি বার মাইলের রাস্তা—সেই দীর্ঘ পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেছিলেন এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। তাদের কাছ থেকেও সেই একই অনুরোধ শুনলেন তিনি—দাদা আপনি নিজেকে বাঁচান। এইবার যতীন্দ্রনাথ বললেন, আমার সঙ্গে তোরা এতদিন রয়েছিস, ভেবেছিলাম তোরা তোদের দাদাকে চিনেছিস। কিন্তু এই কি তার নমুনা? বিপদে তার নিজের জীবনটা বাঁচানো কি নেতার যোগ্য কাজ?

এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "যতীন্দ্রনাথ যদি সেই রাত্রে জ্যোতিষ ও নীরেন্দ্রকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের কাছে না গিয়ে তাঁদের সাবধান করবার জন্য তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে নিজে পলায়ন করতেন, তা'হলে তিনি নিরাপদে অনায়াসে পলায়ন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে ধরনের নেতা ছিলেন না। তিনি অনুচরদের এগিয়ে দিয়ে পিছন থেকে পরিচালনা করতেন না। সর্বাপেক্ষা বিপদ যেখানে বেশি তিনি নিজে সকলের আগে সেখানে যেতেন আর অনুচরদের তাঁর পিছনে নিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে 'শির-দার', তাই তিনি হয়েছিলেন সকলের প্রিয়তম 'সর্দার'।"

কাজেই তাঁর মতো নেতার পক্ষে সহচরদের ফেলে রেখে পলায়ন করা, অথবা নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা দুই-ই অসম্ভব ছিল। সেইজন্য সেই রাত্রেই চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তালডিহিতে গিয়েছিলেন। রাত্রি প্রভাত হলো। সবাহিনী

ডেনহ্যাম তাঁদের অন্বেষিত আসামীর আস্তানায় এসে দেখলেন, সব ফাঁকা, কেউ সেখানে নেই। অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন তাঁরা। সবচেয়ে বেশি বিস্ময়বোধ করলেন যতীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী টেগার্ট। "আমি জানতাম মুখার্জিকে সহজে ধরা যাবে না—He is a first class strategist—তিনি অত্যন্ত কৌশলী মানুষ।" তথাপি পুলিশ সাধুবাবার আশ্রমটি তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করতে ছাড়ল না। কিন্তু বিপ্লবীদের হদিস মেলে এমন কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গিয়েছিল শুধু যতীন্দ্রনাথের নিজের লেখা একখানি খাতা। "এই খাতাখানিতে তিনি যা সব চিন্তা করতেন, মাঝে মাঝে সেইগুলি লিখে রাখতেন।" এটিকে তাঁর ডায়েরি বা দিনলিপি বলা যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই মূল্যবান বস্তুটি পুলিশের হেফাজৎ থেকে আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যদি তা সম্ভব হতো, তা'হলে দেখা যেত যে, পৃথিবীর মহান্ চিন্তা-নায়কদের মধ্যে বাঘা যতীনও একজন।

হাতের মুঠোর মধ্য থেকে শিকার পালিয়ে গেলে শিকারী ব্যক্তির মনের অবস্থাটা যেরকম হয়, বাঘা যতীনকে ধরতে এসে ঠিক সেইরকম অবস্থা হলো ডেনহ্যাম প্রমুখ পুলিশের জাঁদরেল কর্তাদের। ডেনহ্যামের মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা বেরুল—"Strange !"—আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য! ডেনহ্যামের কথার জের টেনে ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি বলেন—"But how could he escape so soon ?"—কিন্তু এত শীঘ্র তিনি পলায়ন করলেন কিভাবে? তখন শুরু হয় পুলিশের চারদিকে ছুটোছুটি—যেমন করেই হোক বিপ্লবীদের হদিস বের করতেই হবে। মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িও খানাতল্লাসী হয়—শুধু তল্লাসী নয়, অকথিত উৎপীড়নও চলে তাঁর উপর, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও তারা বের করতে সক্ষম হয় না। সারাদিন ধরেই অনুসন্ধান চলেছিল কাপ্তিপোদায়। সূর্যোদয়ের পর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় গ্রামের চারদিকে।

৮ই সেপ্টেম্বর। রাত্রিবেলা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

সেই দুর্যোগের রাত্রে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটল মণীন্দ্র চক্রবর্তীর গৃহে। তিনি তো রীতিমত বিস্মিত হলেন তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন : "এত বাধাবিঘ্ন ও এমন সতর্ক পাহাড়া সত্ত্বেও কেমন করে যে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন সেই রাত্রে, এটা আমার কাছে সত্যিই একটি ধাঁধা বলে মনে হয়েছিল।" তখন মণীন্দ্র বাবু তাঁকে তাঁর সারাদিনের অভিজ্ঞ-তার কথা জানালেন এবং আরো সতর্ক হওয়ার জন্য যতীন্দ্রনাথকে একটু সাবধানও করে দিলেন। "জানেন ওরা গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, কয়েকজন বাঙালী ডাকাত এসেছে। তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরিয়ে দিতে পারলেই মাথাপিছু দুশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

যতীন্দ্র নীরবে সব শুনলেন। কিছু বললেন না। তখন মণীন্দ্রবাবু উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন, "এখনো সময় আছে। আপনি যদি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মেঘাসানি পর্বতমালার দিকে চলে যান, তা'হলে শীঘ্রই আপনি বিপদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবেন। আর দেরী নয়। অন্তত দেশের জন্য—"

—না। মণীন্দ্রবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই কঠিন গম্ভীর কণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ বললেন, না। লুকিয়ে থেকে আমাদের সামান্য প্রাণ বাঁচানর সময় এটা নয়। এই সংকট মূহূর্তে একটা কিছু করতেই হবে। এই বলে মণীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা আর একটি রাইফেল চেয়ে নিয়ে তিনি সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়ে তাঁর সহচর চারজনের সঙ্গে মিলিত হলেন। কথিত আছে, বিদায় নেবার সময়ে মণীন্দ্রবাবু ব্যথায় বেদনায় একেবারে বিহ্বলচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন।

পরের দিন। ৯ই সেপ্টেম্বর।

তখনো পূর্বাকাশে প্রত্যূষের আলো ভালো করে ফোটেনি।

সহচরদের সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ এলেন বালেশ্বর শহরের নিকটবর্তী বুড়িবালামের তীরে। পার্বত্য জঙ্গল ভেদ করে যখন তাঁরা নদীর তীরে উপনীত হন তখন গ্রাম্য লোকদের মনে সন্দেহ জাগে। তারা স্থানীয় দফাদারকে খবর দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যে বাঙালী ডাকাতদের আগমন-বার্তা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়। সদরে লোক ছুটল এই সংবাদ জানাবার জন্য। সদরের সংবাদ অবিলম্বে পৌঁছল কাপ্তিপোদায় যেখানে সরকারি বাহিনী তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পথে উন্মত্ত জনতার সঙ্গে তাঁদের কয়েকবার সংঘর্ষ হয় এবং তাঁরা গুলি ছুড়তে বাধ্য হন। নিহত হয় দু'জন, আহত হয় কয়েকজন। এইভাবে গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর তাঁদের সামনে পড়ল একটা নদী। সাঁতার দিয়ে তাঁরা নদী পার হলেন। যতীন্দ্রনাথ তখন জানতে পারেন নি যে, পুলিশের একজন দারোগা ছদ্মবেশে সমানে তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে এবং "সেও দূর থেকে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে একটা গাছের উপর উঠে এঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল।"

এইখানে উল্লেখ্য যে, এক অকল্পিত অবস্থার মধ্য দিয়ে দু'দিন তাঁদের চলতে হয়েছিল। দু'দিন তাঁরা বিশ্রামলাভের সুযোগ পাননি, নিদ্রা যাওয়া তো দূরের কথা। পেটেও কিছু খাদ্য পড়ে নি। সকলেই যেন ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে অবসন্নতা বোধ করছিলেন। পথে একটা দোকান দেখতে পেয়ে সামান্য চিড়ে-মুড়কী ও বাতাসা খেয়ে নিতে পেরেছিলেন। আজ যখন আমরা এই দৃশ্য কল্পনা করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, "যৌবনের প্রারম্ভে যতীন্দ্রনাথ যে বিপ্লব-যজ্ঞের উদ্বোধন করেছিলেন, লোকোত্তর প্রতিভা দিয়ে, অলৌকিক বীরত্ব ও দক্ষতা দিয়ে যে বিপ্লবের আয়োজন করেছিলেন, আজ নির্বাণের পূর্বে নিজেকে শেষ সমিধরূপে আহুতি" দিলেন তিনি কেমন

করে। কী অসাধারণ মনোবল থাকলে এই জিনিস সম্ভব, তা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভবগম্য, ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। কত উঁচুস্তরে মন বাঁধা থাকলে একজন মানুষের পক্ষে এই রকম মনোবল প্রদর্শন করা সম্ভব, তা শুধু অনুমান করা যায়, বুঝিয়ে বলা যায় না।

নদী পার হয়ে তাঁরা উঠলেন একটা ধানের ক্ষেতে।

সেই ধানের ক্ষেত অতিক্রম করে তাঁরা চষাখণ্ড নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তবর্তী একটি অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। নীরেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং যতীন্দ্রনাথ আর অগ্রসর না হয়ে সেইখানে একটি নাতিউচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড় নির্বাচন করলেন। তার একদিকে ছিল একটি পুষ্করিণী আর অন্যদিকে ফাঁকা মাঠ। মাঠের মধ্যে একটা বিরাট উইঢিপি। এইখানেই তিনি তিনদিকে সমর-ক্ষেত্রের মতো একটিট্রেঞ্চ (পরিখা) তৈরি করলেন। অসুস্থ নীরেনকে সেই ট্রেঞ্চের ভিতরে রেখে সেবা করতে করতে তাঁরা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষায় রইলেন। অন্য তিনজন সহকর্মীকে নির্দেশ দিলেন মশার পিস্তল ও দূর-পাল্লার রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে। চিত্তপ্রিয় তাঁর বায়নোকুলার দিয়ে দেখতে পেলেন যে ব্রিটিশবাহিনী সাঁড়াশির মতো দ্রুত তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই বাহিনীর পুরো-ভাগে ছিলেন রাদারফোর্ড ও মেজর ফ্রেম। ঠিক সেইসময়ে মনো-রঞ্জন দেখতে পেলেন যে, নিকটবর্তী একটি গাছের শীর্ষভাগে থেকে একটি লোক একখানি সাদা রুমাল তুলিয়ে সংকেত করছে। লোকটি আর কেউ নয়—সেই ছদ্মবেশী পুলিশের দারোগা। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে দারোগার প্রাণহীন দেহটা গাছ থেকে মাটিতে নিপতিত হয়।

ইতিমধ্যে পলাতকরা কোন্ স্থানে অবস্থান করছে অনুমান করে, "সরকারী বাহিনীর তিনশত রাইফেল গর্জন করে উঠল। প্রান্তর প্রকম্পিত করে দূরের জঙ্গলে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই বাহিনী রাইফেলের গুলি বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চলল।" নির্জন বুড়ি-

বালামের তীর যখন পুলিশের রাইফেলের গর্জনে অনুরণিত হয়ে উঠল, তখনো কিন্তু বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলে না। তখন অপর পক্ষের ধারণা হলো, হয়ত বিপ্লবীদের কাছে দূর-পাল্লার রাইফেল নেই। সৈন্যবাহিনী তখন নিশ্চিন্ত মনে গুলি করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু বিপক্ষের সমস্ত গুলিই সেই উইঢিপির ভিতরে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারো গায়ে লাগছে না। এই ভাবে অগ্রসর হতে হতে সরকারী ফৌজ যেইমাত্র বিপ্লবীদের নাগালের মধ্যে এসে পড়ল, অমনি তাঁদের নেতার কণ্ঠে বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ উচ্চারিত হয়—ফায়ার!

অমনি এদিকের পাঁচটি মশার পিস্তল একসঙ্গে গুলি উদ্গীরণ করতে থাকে। সেই মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের মুখে বহু সরকারী ফৌজ হতাহত হয়। বর্ষার ভিজে মাঠে তারা পিছু হঠতে থাকে। তখন এদিকের গুলিবর্ষণ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ থাকে। বেপরোয়া ভাবে গুলি চালাবার উপায় ছিল না তাঁদের, কারণ তাঁদের সঙ্গে যা ছিল তা নিতান্তই পরিমিত। তাই "সরকারী ফৌজের কেউ যেই উঠে বসে, কিংবা মাথা উঁচু করে তোলে, অমনি বিপ্লবীরা অব্যর্থ সন্ধানে তাকে গুলি করেন।" এই অসম যুদ্ধ চলেছিল তিন ঘণ্টা।

—দাদা, গুলি যে নিঃশেষ হয়ে এলো। বলেন জ্যোতিষ।

—এই নাও, এই বলে যতীন্দ্রনাথ বুলেটের শেষ থলিটি তুলে দেন তাঁর হাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই থলি খুলবার চাবিটি পাওয়া গেল না। আর এমন পুরু চামড়ায় তৈরী ছিল সেই থলি যে সহজে তা খোলা গেল না। যখন তাঁরা ট্রেঞ্চের ভিতর গুলির থলি খুলবার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নিকটবর্তী একটি গাছের শীর্ষভাগ থেকে একটি সিপাহী তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। চিত্ত-প্রিয়ের কানের পাশ দিয়ে গুলিটা ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তে যেই সেই নির্ভীক তরুণ তাঁর মাথাটি ঈষৎ উঁচু করেছেন, অমনি আর একটি গুলির আঘাতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

যতীন্দ্রনাথও ইতিমধ্যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি দারুণ ভাবে জখম হয়ে গিয়েছিল; তথাপি তিনি শুধু তাঁর ডান হাত দিয়েই সমানে গুলি করে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে চিত্তপ্রিয় শুধু একটিমাত্র কথা বলতে পেরেছিলেন—দাদা। "কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শোকেরও অবকাশ নেই। যতীন্দ্রনাথ গভীর স্নেহে সজল নেত্রে বিগতপ্রাণ চিত্তপ্রিয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপরে আবার পিস্তল চালাতে লাগলেন। জ্যোতিষ, মনোরঞ্জন ও নীরেন সকলেই গভীর স্নেহের সঙ্গে চিত্তপ্রিয়ের দেহে হাত বুলিয়ে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ও তেজের সঙ্গে পিস্তল চালনা করতে লাগলেন।" সেই ভূলুণ্ঠিত বীরের বিগতপ্রাণ দেহ থেকে তাঁরা যেন তাঁদের প্রাণের পাত্রে চয়ন করলেন পবিত্র আহিতাগ্নি।

তিন ঘণ্টা সমানে গুলিবর্ষণ করেও বিপক্ষ বাহিনীর পক্ষে বিপ্লবীদের কাছে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এইভাবে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? কিছুক্ষণ পরেই যতীন্দ্রনাথও আহত হলেন মারাত্মকভাবে। তাঁর চোয়াল ও পেট গুলিবিদ্ধ হয় এবং এর ফলে তাঁর দেহ থেকে অজস্র শোণিতধারা নির্গত হতে থাকে। বীরের সেই শোণিতধারায় সিক্ত হয় চষাখণ্ডের মাটি আর সেই রক্তে পবিত্র হয় সেই স্থান যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি তীর্থক্ষেত্র-রূপে পরিগণিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষও গুরুতরভাবে আহত হন। চিত্তপ্রিয় নেই, নেতা ও সহকর্মী জ্যোতিষ উভয়েই ভীষণভাবে জখম হয়েছেন। এমন অবস্থায় মাটিতে রাইফেল নামিয়ে রেখে, মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্র তাঁদের শুশ্রূষার কাজে ব্যস্ত হলেন।

যুদ্ধ শেষ হলো।

বুড়িবালামের তীরে নব ভারতের হলদিঘাটের যুদ্ধ শেষ হলো।

এ যুদ্ধের তুলনা পাওয়া যাবে না ইতিহাসে।

তিনশো বন্দুকধারী সৈন্য একদিকে—

আর অন্যদিকে মশার পিস্তলধারী পাঁচটি তরুণ যোদ্ধা।

স্বাধীনতার বেদীমূলে সমর্পিত প্রাণ এই পঞ্চবীরের বীরত্ব, সাহস আর রণনৈপুণ্য বাঙালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। সৈন্যবাহিনী যখন এগিয়ে এসে বিপ্লবীদের ঘিরে দাঁড়াল তখন যতীন্দ্রনাথ মুমূর্ষু—তাঁর শরীর থেকে প্রচুর শোণিতধারা ক্ষরিত হচ্ছিল। তথাপি নেতা তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট কিলবিকে তিনি বললেন—সমস্ত দায়িত্ব আমার। এরা নির্দোষী। এরা কেবল আমার আদেশ পালন করেছে। এদের উপরে যেন অবিচার না হয়।

নেতার যোগ্য কথাই বটে।

একেই বলে মহাপ্রাণ। মানবেন্দ্রনাথ রায় মিথ্যা বলেন নি, "যতীনদা ছিলেন একজন মানবতন্ত্রী বীরপুরুষ।" বীরত্বের সঙ্গে মহাপ্রাণতার এমন নিদর্শন বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে সত্যিই দুর্লভ। সেদিনও যেমন, আজো তেমনি নেতৃত্বের মধ্যে এই মহাপ্রাণতা দুর্লভ। "সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের মাথায় নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে পারেন।"

এর পরের দৃশ্য বালেশ্বর হাসপাতাল।

মৃত্যুপথযাত্রী যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা হয় বালেশ্বর হাসপাতালে। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। এজন্য কটক থেকে ইংরেজ সার্জন-জেনারেল পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু সব কিছু চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পরের দিন—১৯১৫, ১০ই সেপ্টেম্বর—সেইখানে নির্বাপিত হয় সেই অগ্নিহোত্রী বীরের জীবন-প্রদীপ, নির্বাপিত হয় বিপ্লবের একটি বিরাট অগ্নিশিখা যার আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল শতাব্দীর পট। গুরুপ্রদত্ত রুদ্রাক্ষের সেই মালাটি তখনো তাঁর কণ্ঠলগ্ন ছিল। কথিত আছে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে, টেগার্ট তাঁর মাথার টুপি খুলে, বাঘা যতীনকে

অভিবাদন করে বলেছিলেন, "Can I do anything for you, Mr. Mukherjee?" উত্তরে তিনি শুধু বলেন, "না, ধন্যবাদ।" এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং বালেশ্বর জেলেই ৩রা ডিসেম্বর ফাঁসির মঞ্চে তাঁরা প্রাণত্যাগ করেন আর জ্যোতিষ পাল ১৯২৪ সনে বহরমপুর উন্মাদাগারে মারা যান। এইভাবেই সেদিন এই পঞ্চবীরের জীবন-নাট্যের উপরে নেমে এসেছিল মহাকালের যবনিকা। জন্ম নয়, জীবন নয়, মহামরণই এই পাঁচজনকে করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী। মরণের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের শিলাপটে তাঁরা যে অমর স্পর্শটি রেখে গিয়েছেন তা যেন ব্যর্থ না হয়। আমাদের জীবনে এই বিপ্লবাদের জীবন-চিহ্ন যেন স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকে, তবেই বুঝব আমরা মানুষ।

বাঘা যতীনের জীবনের কথা শেষ হলো।

ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে বিপ্লব-যজ্ঞে তাঁর প্রিয়তম দাদার এবং তাঁর চারজন সহকর্মীর এই পূর্ণাহুতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে ভারতের অকুতোভয় বিপ্লবী-আত্মার অর্ঘ্য দেশমায়ের পায়ে এমনি করে লুটিয়ে পড়েছিল। তাঁরাই প্রথম পথ দেখিয়ে গেলেন স্বল্প শক্তি কেমন করে প্রবল শক্তিকে পাল্টা জবাব দিতে পারে। দেশব্রতী বীরদের পালিয়ে বাঁচার পালা শেষ করে সম্মুখ-সমরে আত্মাহুতির নতুন পথে দেশের বিদ্রোহী শক্তিকে কি করে বলীয়ান করা যায় তাই তাঁরা দেখিয়ে যান। স্বাধীনতার যুদ্ধ-যজ্ঞে বালেশ্বরের যুদ্ধ এমন সমিধ যুগিয়েছিল যে, হোমাগ্নি আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। দেশ সেদিন অপূর্ব সমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত হল।....ভারতের বিদ্রোহী প্রাণ যতীন্দ্রনাথের আত্মদানে একটা নতুন পথ পেল। দেশমাতার ললাটের টীকা সেদিন আরো গৌরবোজ্জ্বল হল।"